হৃদরোগের মহামারী
ও
একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ

ডা. তৃপ্তীশ চন্দ্র ঘোষ

নান্দনিক সৃষ্টিতে অবিচল...
য়ারোয়া বুক কর্নার

হৃদরোগের মহামারী ও একুশে শতকের চ্যালেঞ্জ
ডা. তৃপ্তীশ চন্দ্র ঘোষ

এবিসি সংস্করণ : অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৯
দ্বিতীয় সংস্করণ : ২০০৭
প্রথম প্রকাশ : ২০০৭
কোড : ৮৯/১৯

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রকাশক : জান্নাতুন নিসা

প্রকাশনায়
আরোয়া বুক কর্নার
৮ম তলা (৮০৫), রোজভিউ প্লাজা লিমিটেড
১৮৫ বীর উত্তম সি আর দত্ত রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ০১৭২৬৭৪০৮৬৮, ০১৭১১৭০৪৪০২, ৯৬৬০৬৭৪/৭৬

প্রচ্ছদ : উত্তম গুহ
বর্ণবিন্যাস : এস. এম. আব্দুস সাত্তার
পরিবেশক : পদক্ষেপ
কম্পোজ : মেলবন্ধন প্রকাশনী
১৭ বেইজমেন্ট, কনকর্ড এম্পোরিয়াম শপিং কমপ্লেক্স
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড, ঢাকা-১২০৫
মুদ্রক : মো: উসমান জুন্নুরাঈন
মুদ্রণ : ভেন্ট প্রিন্টিং প্রেস, ভাকুর্তা, সাভার, ঢাকা

মূল্য : ২৭০.০০ টাকা, রুপি : ২৩০.০০
Price : Only Tk. 270.00, US $ 5.00

HRIDROGER MOHAMAREE O EKUSH SHOTOKER CHALLANGE by Dr. Triptish Chanra Ghosh, Published by Jannatun Nesa, Arwa Book Corner (ABC), 7th Floor (805), Rose View Plaza Limited, 185 Bir Uttam CR Dutta Road, Dhanmondi, Dhaka-1205, Phone : 01726740868, 01711704402, 02-9660674, 9660676, e-mail : arwabcinfo@gmail.com

Distributor

India : Pathak Shamabesh Centre, 3/1 College Row., Kolkata-700009; **America :** Muktodhara, Jackson Heights, New York; **United Kingdom :** Songita Limited, 22 Briklen, London; **Canada :** ATN Mega Store, 2970 Danfoth Ave, Anyamela (1st Floor) suite-202, 300 Danfoth Ave. Toronto

ISBN : 978-984-8068-28-1

উৎসর্গ

আমার বাবা-মা
যাঁরা আমাকে এ পৃথিবীর আলো দেখিয়েছেন

আমার দাদা-দিদিরা
যাঁরা তাঁদের স্নেহ-মমতা, শ্রম-ঘাম দিয়ে আমাকে বড় করেছেন

আমার স্ত্রী
যার সাহচর্য এবং অনুপ্রেরণা
আমাকে উদ্যোমী করে

আমার সন্তানেরা
যাদের মধ্যে আমার শৈশব খুঁজি
যাদের নিয়ে আমি স্বপ্ন দেখি

মোড়ক উন্মোচন

বিগত ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৭ অমর একুশের বইমেলায় বাংলা একাডেমির নজরুল মঞ্চে ডা. তৃপ্তীশ চন্দ্র ঘোষ-এর জনসচেতনতামূলক গ্রন্থ **'হৃদরোগের মহামারী ও একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ'**-এর মোড়ক উন্মোচন করা হয়। মোড়ক উন্মোচন করেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা, হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ব্রিগেডিয়ার (অব.) জাতীয় অধ্যাপক ডা. আব্দুল মালিক। আরও উপস্থিত থাকেন–বাংলাদেশ কার্ডিয়াক সোসাইটির সভাপতি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্ডিওলোজি বিভাগের চেয়ারম্যান ডা. কে. এম. এইচ. এস সিরাজুল হক, জাতীয় হৃদরোগ ইন্সটিটিউটের অধ্যাপক ডা. আব্দুল্লাহ্ আল শাফি মজুমদার এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মাহফুজা বেগম।

বাণী

হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. তৃপ্তীশ চন্দ্র ঘোষ-এর লেখা 'হৃদরোগের মহামারী ও একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ' বইটি হৃদরোগ চিকিৎসা ও প্রতিরোধের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। মাতৃভাষায় অত্যন্ত সহজ ও সাবলীলভাবে লেখা চিকিৎসা বিষয়ক এ বইটি পড়ে যে কোনো ব্যক্তি, হৃদরোগী এবং ডাক্তার সকলেই উপকৃত হবেন। মরণব্যাধি হৃদরোগ থেকে বাঁচার লক্ষ্যে সকলের জন্য বইটি বিশেষ সুখপাঠ্য হবে বলে আমি মনে করি।

বইটি একজন সুস্থ মানুষকে হৃদহিতকর জীবনযাপনের জন্য যেমন অনুপ্রাণিত করবে তেমনি একজন হৃদরোগীকে সুষ্ঠুভাবে চিকিৎসা চালিয়ে যেতে পথ নির্দেশনা দেবে এবং হার্ট অ্যাটাক প্রতিরোধে সহায়তা করবে বলে আমি মনে করি। ডা. তৃপ্তীশ চন্দ্র ঘোষ- শিশু-কিশোর, যুবক-বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ তথা সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে হৃদরোগ সম্পর্কে সচেতন করেছেন, সতেজ হৃদয় সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন এবং হৃদরোগ থেকে মুক্ত থাকার উপায়গুলো সুন্দর সহজ সাবলীল ভাষায় লিখেছেন। এরকম তথ্যসমৃদ্ধ একটি বই জনগণকে উপহার দেওয়ার জন্য লেখক অবশ্যই প্রশংসার দাবিদার।

আমি বইটির বহুল প্রচার কামনা করি।

ব্রিগেডিয়ার (অব.) জাতীয় অধ্যাপক ডা. আব্দুল মালিক
তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা
হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ও প্রতিষ্ঠাতা মহাসচিব
ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ

বাণী

'হৃদরোগের মহামারী ও একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ' বাংলা ভাষায় লেখা চিকিৎসা বিষয়ক বইয়ের জগতে এক অনন্য সংযোজন। হৃদরোগ বিষয়ক জনসচেতনতামূলক এ বইটি পড়ে মনে হয়েছে ডা. তৃপ্তীশ চন্দ্র ঘোষ শুধু একজন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ হিসেবে নয় বরং একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে তাঁর সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে এমন একটি বই লিখেছেন। হৃদরোগ একুশ শতকের একটি প্রধান স্বাস্থ্য সমস্যা। হৃদরোগ এখন আর শুধু বয়স্কদের রোগ নয়। বরং এ রোগটি যে কোনো বয়সের শিশু, কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী, পুরুষ এবং মহিলাদের সবার জন্যেই ঝুঁকির কারণ। আর দুঃখজনক হলেও সত্যি হৃদরোগের চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করা যে কোনো দেশে বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলির জন্য বিরাট বোঝা।

তবে আশার কথা হৃদরোগ প্রতিরোধযোগ্য রোগ। ডা. তৃপ্তীশ চন্দ্র ঘোষ তাঁর বইতে সুস্থ সতেজ হৃদয়ের জন্য জীবনযাপন পদ্ধতি, সঠিক খাদ্যাভ্যাস, ব্যায়াম এবং আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে সম্যক ধারণা দিয়েছেন। হৃদরোগে আক্রান্ত হলে সুষ্ঠুভাবে তার চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়া এবং হৃদরোগের জটিলতা ও তা প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কেও বলেছেন। বইটির প্রকাশ একটি সময়োপযোগী পদক্ষেপ। আমি বইটির বহুল প্রচার এবং সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

৩০।৪।০৭

ডা. কে. এম. এইচ. এস সিরাজুল হক
অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান
কার্ডিওলোজি বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
সভাপতি, বাংলাদেশ কার্ডিয়াক সোসাইটি

বাণী

সুহৃদ ও অনুজপ্রতিম ডা. তৃপ্তীশ চন্দ্র ঘোষ-এর লেখা 'হৃদরোগের মহামারী ও একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ' বইটি লেখকের একটি অনবদ্য সৃষ্টি। অত্যন্ত সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় লেখা এই বইটি পড়ে হৃদরোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থাগুলি নিজ জীবনে প্রয়োগ করলে পাঠক বিশেষভাবে উপকৃত হবেন বলে আমার বিশ্বাস।

বইটিতে শিশু-কিশোর, যুবক, নারী-পুরুষ, হৃদরোগী তথা হার্ট ফেইলিউরের রোগী প্রত্যেকের হৃদয়ের জন্যই কিছু বার্তা রয়েছে।

বিভিন্ন তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায় আগামী ২০২০ সাল নাগাদ শতকরা ৩৬ জন মারা যাবে হৃদরোগ ও স্ট্রোকের কারণে। এমনি এক ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে আমরা যখন বসবাস করছি তখন বইটি পড়ে পাঠক আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে জীবনকে দেখবেন এবং জীবনযাপনে হৃদবান্ধব কিছু পরিবর্তন আনতে সচেষ্ট হবেন বলে আমি আশা রাখি।

আসুন আমরা বইটি পড়ি, সংগ্রহ করি, হৃদয়কে সতেজ সুস্থ রাখতে সচেষ্ট হই।

আমি লেখকের সুস্থ হৃদয়, সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করি।

অধ্যাপক ডাঃ আব্দুল্লাহ্ আল শাফি মজুমদার
জাতীয় হৃদরোগ ইন্সটিটিউট, ঢাকা

প্রসঙ্গ কথা

ছাত্রজীবনে পড়াশুনা ও সংস্কৃতিচর্চার পাশাপাশি আরও অনেক কিছুর সাথে কিঞ্চিত কাব্যচর্চাও করতাম। পেশাগত প্রচণ্ড ব্যস্ততার কারণে কাব্যলক্ষ্মী অনেক বছর আগেই নির্বাসিত হয়েছেন। পেশায় হৃদয়ের ডাক্তার তাই চেতনায় এখন কেবল হৃদয়, হৃদরোগ, হৃদরোগের চিকিৎসা এবং হৃদরোগ প্রতিরোধের উপায় এ সবই জুড়ে থাকে। একবিংশ শতাব্দী বিজ্ঞানের চরম উন্নতির যুগ। এর পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া হিসেবে রয়েছে সভ্যতার সংকট। সভ্যতার অনেক সংকটের মধ্যে একটি হলো ক্রমবর্ধমানহারে হৃদরোগে মানুষের আক্রান্ত হওয়া।

এখন পর্যন্ত এ রোগটি উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোতে মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। সুতরাং হৃদরোগ একুশ শতকের একটি প্রধান স্বাস্থ্য সমস্যা। বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে, যদি এই সমস্যাকে এখনই প্রতিরোধ করা সম্ভব না হয় তবে আগামী ২০২০ সাল নাগাদ প্রতি ১০০ জন লোকের মধ্যে ৩৬ জন মারা যাবে হৃদরোগ ও স্ট্রোকের কারণে এবং এই মৃত্যুহার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোতে। আর দুঃখজনক হলেও সত্যি হৃদরোগের চিকিৎসা ব্যয়ভার বহন করা হবে এ সমস্ত দেশগুলোর জন্য এক বিরাট বোঝা।

আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশেও মহামারীর মতো হৃদরোগে আক্রান্ত হচ্ছে নারী-পুরুষ, যুবক-বৃদ্ধ সব বয়সের মানুষই। এই অবস্থাটি ভয়ংকর। হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়া হৃদয়বিদারক। হৃদরোগে আক্রান্ত হলে যেমন চিকিৎসা আছে, তেমনি হৃদয়কে সুরক্ষিত রাখতে প্রতিরোধ ব্যবস্থাও রয়েছে। আমাদের উচিত হৃদরোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থাগুলি সাধারণ মানুষকে অবহিত করা এবং তাদেরকে সচেতন করা। প্রত্যেকেরই স্ব-স্ব অবস্থান থেকে এ লক্ষ্যে দায়িত্ব পালন করা। এ ব্যাপারে সংবাদ-মাধ্যম, গণ-মাধ্যম শক্তিশালী ভূমিকা পালন করতে পারে এবং বর্তমানে করছেও। এদেশের অনগ্রসর বিশাল জনগোষ্ঠীর হৃদরোগ প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমি সাপ্তাহিক কুমিল্লার কাগজ এবং প্রথম আলো, যুগান্তর, ইত্তেফাক সহ বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে বেশ কিছুদিন থেকেই লিখছি মাতৃভাষায় এবং চেষ্টা করছি সহজবোধ্য করতে। শুধু ডাক্তার হিসেবে নয়, একজন সচেতন নাগরিক হিসেবেও। সেই লেখাগুলি থেকে কিছু লেখা সংকলিত করে পাঠকের হাতে তুলে দিতে চাই সাধারণ মানুষের কল্যাণে, সচেতনতার জন্য।

আমার বিশ্বাস শুধুমাত্র সাধারণ জনগণই নয়, চিকিৎসা পেশা বা গবেষণার সাথে সম্পর্কিত সকলের চাহিদা সামান্যতম হলেও মিটাতে সাহায্য করবে এ বইটি।

আমি ডাক্তার হিসেবে চিকিৎসার পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকেই হৃদরোগ প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করছি এবং তারই ধারাবাহিকতায় এদেশের জনগণের ভবিষ্যৎ সুন্দর হৃদরোগমুক্ত জীবনের লক্ষ্যে কুমিল্লায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে হৃদরোগ প্রতিরোধ, চিকিৎসা, পুনর্বাসন ও গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান-হার্ট কেয়ার ফাউন্ডেশন, কুমিল্লা, বাংলাদেশ। এই বই বিক্রয়লব্ধ অর্থ আমি হার্ট কেয়ার ফাউন্ডেশন, কুমিল্লা, বাংলাদেশ-এর তহবিলে দান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

আমার এই বই প্রকাশে আমার মা জ্যোতির্ময়ী ঘোষ-এর আশীর্বাদ আর অনুপ্রেরণা আমাকে প্রত্যয়ী করে তুলেছে। আমার স্ত্রী ডা. মল্লিকা বিশ্বাসের উৎসাহ অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতা আমাকে বইটি শেষ করতে সাহায্য করেছে। আমার ছেলে-মেয়েদের ভালোবাসা আমার কাজের উদ্দীপনা জোগায়।

সর্বোপরি বন্ধুবর আনোয়ার হোসেনের সহযোগিতা না পেলে এ বইটি বোধ হয় আলোর মুখই দেখত না।

ধন্যবাদ জানাই তাদের সহযোগিতার জন্য।

পরিশেষে সকল প্রকার অনাকাঙ্ক্ষিত ত্রুটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে পাঠক বইটি পড়ে বিন্দুমাত্র উপকৃত হলে আমার শ্রম সার্থক হবে।

ডা. তৃপ্তীশ চন্দ্র ঘোষ

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

বইটির প্রথম সংস্করণ এত দ্রুত শেষ হয়ে যাবে আগে ভাবি নি কিন্তু বাস্তবে তাই হয়েছে। পাঠক বইটি গ্রহণ করেছেন সেজন্য আমি আনন্দিত ও উৎসাহিত। ধন্যবাদ জানাই সকল ক্রেতা ও পাঠককে। পাঠকের চাহিদার কথা ভেবেই বইটির পুনঃমুদ্রণের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

দ্বিতীয় সংস্করণে-পূর্বের মুদ্রণজনিত ত্রুটি কাটিয়ে উঠার চেষ্টা করা হয়েছে। সংযোজন করা হয়েছে একুশের বইমেলায় বইটির মোড়ক উন্মোচনের ছবি ও তাঁদের বক্তব্য। মোড়ক উন্মোচন করেছিলেন এদেশের হৃদরোগ চিকিৎসা এবং প্রতিরোধ আন্দোলনের পথিকৃৎ, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা, জাতীয় অধ্যাপক, ব্রিগেডিয়ার (অব.) ডা. আব্দুল মালিক। আরও উপস্থিত থাকেন-বাংলাদেশ কার্ডিয়াক সোসাইটির সভাপতি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্ডিওলোজি বিভাগের চেয়ারম্যান ডা. কে. এম. এইচ. এস সিরাজুল হক, জাতীয় হৃদরোগ ইন্সটিটিউটের অধ্যাপক ডা. আব্দুল্লাহ্ আল শাফি মজুমদার এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা মাহফুজা বেগম।

বইটির মাধ্যমে জনসাধারণের ভিতর হৃদরোগ ও এর ব্যাপ্তি সম্পর্কে সচেতনতা আসুক এবং এ রোগের প্রতিরোধে সবাই উদ্বুদ্ধ হোক। তাহলেই আমার শ্রম সার্থক হবে বলে মনে করবো।

ডা. তৃপ্তীশ চন্দ্র ঘোষ

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ২০০৭ সালে। তারপর সে বছরই দ্বিতীয় প্রকাশ। তারপরও দ্রুতই শেষ হয়ে যায়। প্রথম প্রকাশের ১২ বছর পরও এ বইয়ের প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে যায় নি। সেই বিবেচনা থেকেই বইটি তৃতীয় সংস্করণের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

ডা. তৃপ্তীশ চন্দ্র ঘোষ

সূ চি প ত্র

শিশুকিশোর ও হৃদরোগ ১৭
অতিরিক্ত ওজন ও হৃদরোগ ২০
অপর্যাপ্ত শারীরিক শ্রম ও হৃদরোগ ২৪
দ্রুত হাঁটা, জগিং-এর মতোই উপকারী ২৮
ধূমপান ও হৃদরোগ ৩০
ডায়াবেটিস ও হৃদরোগ ৩৪
উচ্চ রক্তচাপ একটি নীরব ঘাতক ৩৯
নারী ও হৃদরোগ ৪৭
হৃদরোগ ও গর্ভবতী নারী ৫০
মেটাবলিক সিনড্রোম ও হৃদরোগ ৫৬
কোলেস্টেরল ও হৃদরোগ ৬০
বুকে ব্যথা হলে কি করবেন? ৬৮
হার্ট অ্যাটাকের পর ৭২
হৃদরোগ ও দাম্পত্যজীবন ৭৮
হার্ট ফেইলিউর-এর সাথে বসবাস ৮১
হৃদরোগের মহামারী ও একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ ৮৫
বিশ্ব প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের অবস্থান ৮৬

শিশু-কিশোর ও হৃদরোগ

একটি দেশের ভবিষ্যত হচ্ছে আজকের বাড়ন্ত শিশু। শিশুদের সুস্থ এবং স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠার জন্য শিক্ষার পাশাপাশি তাদের সুস্বাস্থ্যের কথাও অভিভাবকদের ভাবতে হয়। আর এই সুন্দর স্বাস্থ্য গড়ে তোলার জন্য তাদের প্রয়োজন পর্যাপ্ত খেলাধূলা, শারীরিক ব্যায়াম, পুষ্টিসম্পন্ন খাবার ইত্যাদির। বর্তমান বিশ্বে শিশুরা বেড়ে উঠছে খুবই অস্বাস্থ্যকর জীবন-যাত্রার মধ্য দিয়ে। যার মধ্যে রয়েছে নিম্নমানের খাবার, ধূমপান বা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং অপর্যাপ্ত শারীরিক পরিশ্রম। এসব কারণে এরা কিছু সাধারণ রোগব্যাধি যেমন–জ্বর, সর্দি, কাশি, হাম, ডায়রিয়া ইত্যাদিতে আক্রান্ত হয়ে থাকে। এসব রোগের প্রতিরোধ করা সহজেই সম্ভব। এসবের পাশাপাশি অস্বাস্থ্যকর ঘনবসতিপূর্ণ পরিবেশের কারণে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে শিশুরা বাতজ্বরজনিত হৃদরোগেও আক্রান্ত হয়ে থাকে। তবে এরচেয়েও ভয়াবহ যে বিষয়টি রয়েছে তাহলো ভবিষ্যতে বড় হওয়ার পর তাদের করোনারি হার্ট ডিজিস বা হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা। কেননা এই জটিল রোগের উপাদানগুলি শৈশব থেকেই তাদের সাথে সাথে বৃদ্ধি পেতে থাকে। সুতরাং এই উপাদানগুলো কি, কিভাবে তাদের বিস্তার হয় এবং কিভাবে তাদের প্রতিরোধ সম্ভব– এই বিষয়গুলি সম্পর্কে আমাদের সম্যক ধারণা থাকাটা অত্যন্ত জরুরি।

হৃদরোগ মুক্ত স্বাস্থ্যকর জীবন-যাপনের পথে বাধাসমূহ

অতিরিক্ত ওজন বা স্থূলতা (Obesity/Overweight)– অতিরিক্ত ওজন বা স্থূলতা আধুনিক জীবন-যাপনের অন্তরায় স্বরূপ। অতিরিক্ত ওজনের ফলে স্বাভাবিক আয়ুষ্কাল গড়ে ৯ বছরের মতো কমে যায়। এছাড়া এই অতিরিক্ত শারীরিক ওজন -হৃদরোগ, ডায়াবেটিস (টাইপ ||), উচ্চরক্তচাপ, মাত্রাতিরিক্ত চর্বি এবং স্ট্রোকের অন্যতম কারণ এবং অতিরিক্ত ওজন এ সমস্ত রোগে মৃত্যুর ঝুঁকিও বহুলাংশে বাড়িয়ে দেয়।

শিশুদের মধ্যে অতিরিক্ত ওজনজনিত সমস্যা পৃথিবীর কিছু কিছু দেশে যেমন : ইউরোপ, আমেরিকায় ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। সারাবিশ্বে ২ কোটি ২০ লক্ষ শিশু (যাদের বয়স ৫ বছরের নিচে) মেদ ও অতিরিক্ত ওজনজনিত সমস্যায় ভুগছে। অতিরিক্ত ওজনের সমস্যাটা বর্তমানে শুধু উন্নত বিশ্বেরই নয়, স্বল্পোন্নত

দেশেও প্রভাব ফেলেছে। যদি এই ধারা অব্যাহত থাকে, তবে এই শিশুদের মধ্যে হৃদরোগ ও স্ট্রোক-এর হার বহুলাংশে বেড়ে যাবে, যা এদের আয়ুকেও কমিয়ে দিবে।

- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ৫ থেকে ১৪ বছর বয়সী প্রতি ৩ জনের মধ্যে ১ জন অতিরিক্ত ওজন জনিত রোগে ভুগছে। গত ৩ বছর আগে এই হার ছিল বর্তমানের অর্ধেক।
- চীনে প্রতি ৫ জন স্কুলগামী শিশুর মধ্যে ১ জন মোটা।
- থাইল্যান্ডে ৬-১২ বছর কিশোরদের মধ্যে এ রোগের হার দুই বছরে ১২.২% থেকে বেড়ে ১৫.৬% হয়েছে। ১৯৯২ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে শিশুদের ওজন বৃদ্ধির হার ১০ থেকে বেড়ে হয়েছে ১৬%।

এসব তথ্য পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকে সংগৃহীত কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি যে আমাদের দেশে এই ধরনের কোনো গবেষণা এবং তথ্য নেই। তাই বলেতো রোগব্যাধি আর বসে থাকবে না। সুতরাং আমাদেরকে এই রোগব্যাধির প্রতিরোধে আরও বেশি সচেতন হতে হবে। এ কারণে শরীরের ওজন স্বাভাবিক বা নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।

সম্প্রতি ৪-১৫ বছরের ১৩০ জন অতিরিক্ত ওজনসম্পন্ন শিশুর মধ্যে পরিচালিত এক জার্মান সমীক্ষায় দেখা গেছে যে,

- বি.এম.আই. ১-২ কমানোর মাধ্যমে হৃদরোগের ঝুঁকি বহুলাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব।
- অপরদিকে ওজন বৃদ্ধির সাথে সাথে সেই সমস্ত শিশুদের মধ্যে (টাইপ II) ডায়াবেটিসের ঝুঁকিও বেড়ে যায়।
- মোটা শিশুদের হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা অন্যান্য শিশুদের থেকে ৩-৫ গুণ বেশি।

ধূমপান (Smoking) - একজন অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু বা কিশোর তার যেকোন বয়সেই ধূমপান আরম্ভ করতে পারে। ফলে ওই শিশু ধূমপানজনিত রোগের একটি বড় ধরনের ঝুঁকির সম্মুখে থাকে। এদের মধ্যে অর্ধেক শিশু-কিশোর ধূমপান ক্রমান্বয়ে চালিয়ে যেতে থাকে, যা তাদের বার্ধক্যে মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ ধূমপানের ফলে তারা ভবিষ্যতে আক্রান্ত হয় করোনারি/ইস্কেমিক হার্ট ডিজিস, উচ্চ রক্তচাপ, স্ট্রোক, হাঁপানী, যক্ষা, ফুসফুসে ক্যানসার, পেপটিক আলসার ইত্যাদি নানা জটিল রোগে। একজন অনেকদিনের ধূমপায়ীর মৃত্যুর শতকরা ৫০ ভাগ কারণ সিগারেটের সাথে নিকোটিন সেবন এবং বাকি শতকরা ৫০ ভাগ হয়ে থাকে ধূমপানজনিত হৃদরোগের কারণে।

বেশিরভাগ ধূমপায়ী তাদের ধূমপান শুরু করে ১০ বছর বয়সের পূর্বেই। যত কমবয়সে ধূমপান শুরু করবে হৃদরোগের সম্ভাবনা বা ঝুঁকি বাড়ে তত বেশি। ধূমপান করে না, কিন্তু ধূমপায়ীদের আশে-পাশে অবস্থানকারীদের হৃদরোগের ঝুঁকি বেড়ে যায় শতকরা ৩০ ভাগ। এই মরণছোঁয়া শিশুদের দিকেই আগে হাত বাড়াতে থাকে। পৃথিবীর অর্ধেকের বেশি শিশু Passive smoking বা পরোক্ষ ধূমপান-এর শিকার হচ্ছে যেহেতু বাড়িতে তাদের বসবাস করতে হচ্ছে ধূমপায়ী পিতামাতার বা আত্মীয়স্বজনদের সাথে। ধূমপানের বিশেষ প্রভাব পড়ে গর্ভে থাকাকালীন শিশুর উপর। যা ভবিষ্যতে তার জন্য ক্ষতি বয়ে আনে।

অলসতা (Physical inactivity)-যদিও প্রকৃতিগতভাবেই শিশুরা চঞ্চল ও উদ্যোমী হয়ে থাকে, তারপরও দেখা যায় দুই-তৃতীয়াংশ শিশুই তাদের সু-স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজনীয় শারীরিক পরিশ্রম করে না। এসকল শিশুরাই বড় হয়ে মোটা হয়ে যায় এবং পরবর্তীকালে তাদের হৃদরোগের ঝুঁকিও বেড়ে যায় দ্বিগুণ। ৫০ বছর পূর্বের শিশুদের তুলনায় আজকের শিশুরা অপর্যাপ্ত শারীরিক শ্রম ও অলসতায় আক্রান্ত। পূর্বে ফুটবল, হা-ডু-ডু, গোল্লাছুট এবং দড়িলাফানোর মতো খেলাধূলার সময়টা পাল্টে গিয়ে বর্তমানে দীর্ঘ সময় টেলিভিশন/কম্পিউটারের সামনে অতিবাহিত হচ্ছে। সাথে যোগ হয়েছে অপুষ্টিকর ফাস্টফুড খাবার। ক্রমবর্ধমান নগরায়ন, শহরে পুকুর ও খেলার মাঠের অভাব, টেলিভিশন এবং কম্পিউটারে অতিরিক্ত সময় ব্যয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শারীরিক শিক্ষার অভাব ইত্যাদি অনেক কিছুই আজ শিশুর অপর্যাপ্ত শারীরিক শ্রমের জন্য দায়ী।

সুতরাং আপনার শিশুকে নিয়মিত ব্যায়াম ও সুষম খাবার গ্রহণের মাধ্যমে অতিরিক্ত ওজন নিয়ন্ত্রণ করে এবং ধূমপান মুক্ত পরিবেশে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হোন। এর মাধ্যমেই আগামী প্রজন্মকে হৃদরোগের কড়াল গ্রাস থেকে মুক্ত রাখা সম্ভব।

অতিরিক্ত ওজন ও হৃদরোগ

অতিরিক্ত ওজন বা স্থূলত্ব আধুনিক জীবন-যাপনের অন্তরায় স্বরূপ। অতিরিক্ত ওজনের ফলে স্বাভাবিক আয়ুষ্কাল গড়ে ৯ বছরের মতো কমে যায়। এছাড়া অতিরিক্ত শারীরিক ওজন হৃদরোগ, ডায়াবেটিস (টাইপ II), উচ্চ রক্তচাপ, মাত্রাতিরিক্ত চর্বি এবং স্ট্রোকের অন্যতম কারণ। আর অতিরিক্ত ওজন এ সমস্ত রোগে মৃত্যুর ঝুঁকিও বহুলাংশে বাড়িয়ে দেয়। শিশুদের মধ্যে অতিরিক্ত ওজনজনিত সমস্যা পৃথিবীর কিছু কিছু দেশে যেমন : ইউরোপ, আমেরিকায় ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। সারাবিশ্বে ২ কোটি ২০ লক্ষ শিশু (যাদের বয়স ৫ বছরের নিচে) মেদ ও অতিরিক্ত ওজনজনিত সমস্যায় ভুগছে। অতিরিক্ত ওজনের সমস্যাটা বর্তমানে শুধু উন্নত বিশ্বেরই নয়, স্বল্পোন্নত দেশেও প্রভাব ফেলেছে। যদি এই ধারা অব্যাহত থাকে, তবে এই শিশুদের মধ্যে হৃদরোগ ও স্ট্রোক-এর হার বহুলাংশে বেড়ে যাবে, যা এদের আয়ুকেও কমিয়ে দিবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ৩ জন শিশুর মধ্যে ১ জন– যাদের বয়স ৫ থেকে ১৪ বছরের মধ্যে, অতিরিক্ত ওজনে ভুগছে। গত ৩ বছর আগে এই হার ছিল বর্তমানের অর্ধেক। চীনে প্রতি ৫ জন স্কুলগামী শিশুর মধ্যে ১ জন মোটা। থাইল্যান্ডে ৬-১২ বছরের শিশু-কিশোরদের মধ্যে এ রোগ দুই বছরে ১২.২% থেকে বেড়ে ১৫.৬% হয়েছে। ১৯৯২ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে শিশুদের ওজন আধিক্যের হার ১০ থেকে বেড়ে হয়েছে ১৬%। এসব তথ্য পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকে সংগৃহীত, কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে আমাদের দেশে এই ধরনের কোনো গবেষণা এবং তথ্য নেই। তা বলে তো রোগব্যাধি আর বসে থাকবে না। সুতরাং আমাদেরকে এই রোগব্যাধির প্রতিরোধে আরও বেশি সচেতন হতে হবে। এ কারণে শরীরের ওজন স্বাভাবিক বা নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।

বেশি ওজন থাকলেই উচ্চ পরিমাণে ট্রাইগ্লিসারাইড (টিজি) ও লো-ডেনসিটি লাইপোপ্রোটিন (এলডিএল) থাকার সম্ভাবনা থাকে এবং কম হাই-ডেনসিটি লাইপোপ্রোটিন (এইচডিএল) থাকার সম্ভাবনা থাকে। এছাড়াও উচ্চ রক্তচাপ বা ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যদি আপনার ভূড়ি থেকে থাকে বা কোমরে মেদ থাকে তবে আপনার মেটাবোলিক সিন্ড্রোম থাকার সম্ভাবনা আছে। অতিরিক্ত ওজন কমিয়ে ফেললে স্বাস্থ্য ঝুঁকি কমে আর কোলেস্টেরল ও টিজির মাত্রা কমে যায়।

আপনি যদি হৃদরোগ হওয়ার ঝুঁকির মধ্যে কিংবা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে থাকেন, তবে সহজেই তা দু'ভাবে যাচাই করা যায় - আর তা হলো কোমরের মাপ ও বি এম আই। ব্যাপক নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, অতিরিক্ত ওজন, বি.এম.আই. এবং হৃদরোগের মৃত্যুর হার ওতপ্রোতভাবে জড়িত। স্বাভাবিকের চেয়ে যাদের ওজন বেশি তাদের বি.এম. আই বেশি এবং তাদের হৃদরোগে মৃত্যুর হারও বেশি।

কোমরের মাপ

সার্বিক স্থূলতার পাশাপাশি তলপেটে চর্বির আধিক্য হৃদরোগের ঝুঁকি নিরূপণে অধিক গুরুত্ব রাখে। এই তলপেটের চর্বি কোমরের মাপের সাহায্যে নির্ণয় করা যায়। আপনার হৃদরোগের ঝুঁকি ক্রমশ বাড়বে–মহিলা হিসেবে কোমরের মাপ ৮৮ সে.মি. থেকে অধিক হলে এবং পুরুষদের ক্ষেত্রে ১০২ সে.মি. থেকে অধিক হলে।

- < ১০২সে.মি. (৪০ ইঞ্চি) > ×
- < ৮৮সে.মি. (৩৬ ইঞ্চি) > ×

বি.এস.আই

- **বি.এম.আই.** / BMI (Body Mass Index) অবশ্যই ২৫ বা তার কম রাখা উচিত।

BMI নিচের ফরমূলা দ্বারা বের করা যায়–

$$BMI = \frac{Wt.\ Kg.}{Ht.\ in\ Metre^2} \qquad \text{বি.এম.আই} = \frac{\text{কিলোগ্রামে ওজন}}{\text{মিটারে উচ্চতা}^2}$$

বি. এম. আই. / BMI	শারীরিক ওজন	ঝুঁকির মাত্রা
১৮.৫ বা এর কম	কম ওজন	–
১৮.৫ থেকে ২৪.৯	স্বাভাবিক ওজন	–
২৫.০ থেকে ২৯.৯	বেশি ওজন	সামান্য বেশি
৩০.০ থেকে ৩৪.৯	মোটা	বেশি
৩৫.০ থেকে ৩৯.৯	বেশি মোটা	খুব বেশি
৪০.০ বা এর বেশি	খুব বেশি মোটা	মারাত্মক

সম্প্রতি ৪ থেকে ১৫ বছরের ১৩০ জন অতিরিক্ত ওজনসম্পন্ন শিশুর মধ্যে পরিচালিত এক জার্মান সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, বি.এম.আই. ১-২ কমানোর মাধ্যমে হৃদরোগের ঝুঁকি বহুলাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব। অপরদিকে ওজন বৃদ্ধির সাথে সাথে সেই সমস্ত শিশুদের মধ্যে (টাইপ II) ডায়াবেটিসের ঝুঁকিও বেড়ে যায়। অন্য আরেক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, ৫৪ জন ছেলে এবং ২৮ জন মেয়ে যাদের গড় বয়স ৯.৯ বছর, তাদের বি.এম.আই./BMI (Body Mass Index) নির্ণয় করে দেখা গেছে যে, তাদের মধ্যে ২৮ জনের বেশি ওজন এবং ৫৪ জন মোটা। মোটা শিশুদের হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা অন্যান্য শিশুদের থেকে ৩-৫ গুণ বেশি।

অতিরিক্ত ওজন নিয়ন্ত্রণের উপায়

ওজন কমানোর জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট ওষুধ বা পদ্ধতি নেই। আপনার জীবনযাত্রার ধরন পাল্টাতে হবে। সঠিক ক্যালরি গ্রহণ করার পাশাপাশি এবং শারীরিকভাবে কর্মতৎপর থাকতে হবে। আপনার লক্ষ্য শুধু অতিরিক্ত ওজন কমিয়ে ফেলা নয় বরং ওজন বাড়তে না দেয়াও বটে। ওজন কমানোটা কষ্টকর - সত্যি বলতে কী এটা চ্যালেঞ্জ।

ওজন

- নিয়মিত আপনার শারীরিক ওজন পরীক্ষা করুন।
- যদি কখনও মনে হয় আপনি মোটা হয়ে যাচ্ছেন, তাহলে অবশ্যই অতি সত্বর ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করুন।

খাদ্যনিয়ন্ত্রণ

অতিরিক্ত শারীরিক ওজন নিয়ন্ত্রণে এনে সুন্দর মেদহীন স্বাস্থ্য গড়ে তুলতে হবে। সুতরাং সমন্বিত খাদ্যাভ্যাসের মাধ্যমে ওজন নিয়ন্ত্রণ করে স্বাস্থ্য সুন্দর রাখতে সচেষ্ট হতে হবে। হৃদযন্ত্রের কয়েকটি অসুখ যেমন করোনারি আর্টারি ডিজিজ, বা ইসকেমিয়ার ক্ষেত্রে খাদ্যাভ্যাসের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। হৃদরোগীদের খাদ্য নিয়ন্ত্রণ, চিকিৎসার একটি বিশেষ অঙ্গ। চিকিৎসকের পরামর্শ মতো খাওয়া-দাওয়া নিয়ন্ত্রণ করে অতিরিক্ত ওজন তথা হৃদরোগকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব।

খাদ্য পরিহার

বাজারের তৈরি ভাজা-পোড়া, ফাস্টফুড (বার্গার, পিৎজা, হট-ডগ ইত্যাদি) অতিরিক্ত চিনি, চকলেট, মিষ্টি এবং লবণ। রেড মিট (গরু/খাসি)। প্রাণিজ চর্বি, দুধের সর, ঘি, মাখন, ডিমের কুসুম ইত্যাদি খাওয়া থেকে বিরত থাকুন।

খাদ্য গ্রহণ

- আপনার শিশুকে অবশ্যই পর্যাপ্ত মাতৃদুগ্ধ পান করাবেন।
- আপনার খাদ্য তালিকায় বেশি করে ফল ও আঁশযুক্ত খাবার রাখবেন (যেমন–সবুজ শাকসব্জি, ভূষিযুক্ত আটার রুটি, ভেজানো ছোলা, ডাল, বাদাম ইত্যাদি)।
- রান্নার তেল হিসেবে পলি আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি এসিড অর্থাৎ সয়াবিন তেল, সূর্যমুখী তেল এবং সরষের তেলও ব্যবহার করা যেতে পারে।
- আমিষ খাবারের মধ্যে ছোট মাছ, যে কোনো সামুদ্রিক মাছ, মুরগীর মাংস, ডিমের সাদা অংশ ইত্যাদির তালিকা রাখবেন।
- সামুদ্রিক মাছের তেলে যে ওমেগা থ্রি ফ্যাটি এসিড আছে তা হৃদরোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে।

আপনার রসনা না কমিয়ে কম ক্যালরি গ্রহণের উপায় সম্পর্কে কিছু টিপস–

- গবেষণায় দেখা গেছে, খাবার খাওয়ার ১৫ মিনিট পরে মস্তিষ্কে সিগন্যাল যায় যা আপনি খেয়েছেন। তাই তাড়াহুড়া না করে সময় নিয়ে খান।
- বেশি পরিমাণ ফল খান তাহলে পেটও ভরবে আর ক্যালরিও কম গ্রহণ করা হবে।
- ছোট প্লেটে খাবার নিন। তাহলে আপনার নেয়া খাবার অনেক বড় দেখাবে।

ব্যায়াম

- প্রতিদিন ব্যায়াম করুন।
- আপনার শিশুকে সবসময় সক্রিয় বা কর্মঠ হতে উদ্বুদ্ধ করুন।
- নিয়মিত খেলাধূলা করুন যেমনঃ ফুটবল, ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন, সাঁতার, দৌড়, দড়িলাফানো, নাচ ইত্যাদি। এছাড়া হাঁটা, বাগান করা এবং সাইকেল চালানো এমন ধরনের কাজে সম্পৃক্ত থাকবেন।

নিয়মিত শারীরিক ব্যায়াম ও খেলাধূলা এবং সমন্বিত খাদ্যাভ্যাস আপনাকে অতিরিক্ত ওজনজনিত রোগ (Obesity) থেকে মুক্ত রাখতে পারে। আর এভাবেই আগামী প্রজন্মকে হৃদরোগের ভয়াবহ ঝুঁকি থেকে মুক্ত রাখা সম্ভব।

অপর্যাপ্ত শারীরিক শ্রম ও হৃদরোগ

হার্ট ডিজিস বা হৃদরোগ এক মারাত্মক ঘাতকব্যাধি। আর অপর্যাপ্ত শারীরিক শ্রম হলো হৃদরোগের অন্যতম কারণ। ক্রমবর্ধমান ফাস্টফুডের ব্যবহার এবং শরীরচর্চা না করার কারণে এশিয়ায় হৃদরোগের প্রকোপ মারাত্মকভাবে বাড়ছে। বিশেষজ্ঞগণ বলছেন, যাদের কম বয়সে হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার পারিবারিক ইতিহাস রয়েছে, তাদের পরবর্তী ১০ বছরে হার্ট অ্যাটাকে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি ১০ থেকে ২০ গুণ বেশি। যদিও প্রকৃতিগতভাবেই শিশুরা চঞ্চল ও উদ্যোমী হয়ে থাকে, তারপরও দেখা যায় দুই-তৃতীয়াংশ শিশুই তাদের সু-স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজনীয় শারীরিক পরিশ্রম করে না। এসকল শিশুরাই বড় হয়ে মোটা হয়ে যায় এবং পরবর্তীতে তাদের হৃদরোগের ঝুঁকি বেড়ে দ্বিগুণ হয়। ৫০ বছর পূর্বের মানুষের তুলনায় আজকের মানুষেরা অপর্যাপ্ত শারীরিক শ্রমে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে। পূর্বে গোল্লাছুট, হা-ডু-ডু,দড়ি লাফানো এবং ফুটবল ইত্যাদি খেলাধূলার পরিবর্তে বর্তমানে দীর্ঘসময় টেলিভিশন ও কম্পিউটারের সামনে অতিবাহিত হচ্ছে। এর সাথে যুক্ত হচ্ছে অপুষ্টিকর ফাস্টফুড খাবার যেমনঃ বার্গার, পিৎজা, হট-ডগ, ইত্যাদি। নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম যথাযথই শরীরের ওজন, উচ্চ রক্তচাপ, প্লাজমা লিপিডস, গ্লুকোজ সহনিয়তা (Glucose Tolerance) এবং ইনসুলিন অসংবেদনশীলতা (Insul in Resistance) জনিত হৃদরোগ থেকে মুক্ত রাখতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। তদুপরি সুস্থ মানসিক বিকাশে নিয়মিত শারীরিক ব্যায়াম বিশেষ প্রভাব রেখে থাকে। বর্তমান বিশ্বের বেশিরভাগ কর্মস্থলে এখন অবসর সময়ে হালকা শারীরিক ব্যায়ামের সুযোগ নেই বললেই চলে, যা সুস্থ হৃদরোগ মুক্ত জীবন-যাপনে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই একটি সুন্দর স্বাস্থ্যকর এবং হৃদরোগমুক্ত জীবনের জন্যে কর্মস্থলে বিরতির কিছুটা হলেও হালকা শারীরিক ব্যায়াম করা উচিত। বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে শারীরিক কর্মঠ ব্যক্তিদের তুলনায় অলস ব্যক্তিদের মধ্যে হৃদরোগের হার দ্বিগুণ এবং নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম বা ব্যায়াম হৃদরোগের কারণে মৃত্যুর হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করে।

অপর্যাপ্ত শারীরিক শ্রমের কারণসমূহ

- ক্রমবর্ধমান নগরায়নের কারণে গ্রামে পায়ে হাঁটা, ক্ষেতে খামারে কাজ, গোল্লাছুট, হা-ডু-ডু, দড়ি-লাফানো, সাঁতার, নৌকা বাইচ ইত্যাদির স্থান দখল করেছে নগরের আটপৌরে জীবন।
- অতিরিক্ত ঘুম।
- শহরে পুকুর, খেলার মাঠের অভাব।
- টেলিভিশন এবং কম্পিউটারে অতিরিক্ত সময় ব্যয়।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শারীরিক শিক্ষার অভাব।
- বয়স্কব্যক্তি, বিশেষ করে যাদের মধ্যে হৃদরোগের অন্যান্য ঝুঁকি বিদ্যমান।
- সর্বোপরি অশিক্ষা এবং অসচেনতা।

অপর্যাপ্ত শারীরিক শ্রম প্রতিকারের উপায়

- নিয়মিত শারীরিক শ্রম বা ব্যায়ামের উপকারিতা সম্পর্কে সকলকে অবহিত করতে হবে।
- শিশু-কিশোরদের জন্য পরিবারে প্রতিদিন হালকা মানের কায়িক শ্রম বা ব্যায়ামের জন্য কিছু সময় নির্ধারিত রাখুন।
- শারীরিক ও মানসিক সীমাবদ্ধতার কারণে শিশুকে কোনো কাজে যুক্ত বা কাজ থেকে বিরত রাখবেন না। শিশুর শারীরিক ক্ষমতা অনুযায়ী তাকে কাজ করতে উৎসাহিত করুন।
- শিশুকে সেই ধরনের খেলাধূলায় উৎসাহিত করুন, যা থেকে সে আনন্দ পায়।
- শিশুকে কোন ধরনের কাজের পুরস্কার হিসেবে খাদ্যবস্তুর পরিবর্তে কায়িক শ্রম হয় এই ধরনের খেলনা উপহার দিন।
- বেশি সময় টেলিভিশন দেখা থেকে বিরত থাকুন এবং পরিবারে অন্যদেরকেও নিরুৎসাহিত করুন।
- অফিস-আদালতে বা কম্পিউটারে একটানা বসে না থেকে নির্দিষ্ট সময় অন্তর বিরতি নেয়া এবং সেই সময় হালকা মানের ব্যায়াম করুন।
- পাড়া-মহল্লায় খেলার মাঠ এবং ব্যায়ামাগার স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিয়মিত শারীরিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা।
- বাংলাদেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে ব্যায়াম এবং তার সুফল সম্পর্কে সচেতন করে তোলা।

শারীরিক শ্রম/ব্যায়াম-এর সময় আমাদের ৩টি বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। যেমন-

১. ব্যায়ামের তীব্রতা (Intensity)
২. ব্যায়ামের স্থিতিকাল/স্থায়িত্ব (Duration)
৩. ব্যায়ামের ধারাবাহিকতা/পৌনঃপুনিকতা (Frequency)

ব্যায়ামের তীব্রতা

ব্যায়ামের চূড়ান্ত পর্যায়ে একজন ব্যক্তির হৃদপিণ্ডের গতি কতটুকু তা দিয়েই বোঝানো হয় ব্যায়ামের তীব্রতা কতটুকু। সাধারণত কাঙ্ক্ষিত হৃদপিণ্ডের গতি হলো রোগীর বয়স অনুযায়ী সর্বোচ্চ গড় হৃদস্পন্দনের শতকরা ৬০-৭৫ ভাগ (অর্থাৎ ব্যায়ামে হৃদস্পন্দন ৬০-৭৫ ভাগ পর্যন্ত হলেই আমরা তা যথেষ্ট বলে ধরে নেব)।

বয়স অনুযায়ী ব্যায়ামের সময় কাঙ্ক্ষিত হৃদপিণ্ডের গতির হার

বয়স (বছরে)	হৃদস্পন্দন (প্রতি মিনিটে)
২০-২৯	৯৫-১১৫
৩০-৩৯	১১৫-১৪৫
৪০-৪৯	১১০-১৪০
৫০-৫৯	১০৫-১৩০
৬০-৬৯	১০০-১২৫

কাঙ্ক্ষিত হৃদপিণ্ডের গতি অর্জন করা সম্ভব সেই সব ব্যায়ামে যাতে শরীরের বৃহৎ মাংসপেশীগুলো জড়িত থাকে যেমন - হাঁটা, জগিং, সাইকেল চালানো, সাঁতার কাটা, ব্যাডমিন্টন, ফুটবল, টেনিস, ভলিবল, দড়ি লাফানো, নাচা ইত্যাদি।

ব্যায়ামের স্থিতিকাল এবং ধারাবাহিকতা

সাধারণত মুক্তবায়ুতে দিনে ৩০ মিনিট করে সপ্তাহে ৫ দিন ব্যায়ামই যথেষ্ট। এই ৩০-৪০ মিনিটের মধ্যে প্রথম ৫-১০ মিনিট হচ্ছে ব্যায়ামের প্রাথমিক অবস্থা (warm up phase)। সেই সময়ে হালকাভাবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের মাধ্যমে ব্যায়াম আরম্ভ করতে হবে এবং পরবর্তী ২০-৩০ মিনিট (aerobic phase) ব্যায়ামের মাত্রা বৃদ্ধি করতে হবে। শেষের ৫-১০ মিনিটে (cool down phase) ব্যায়ামের তীব্রতা কমিয়ে পূর্বের স্থিতাবস্থায় আসতে হবে। অবশ্য ব্যায়ামের এই সময়কাল বাড়ালে সপ্তাহে ২-৩ দিন ব্যায়ামই যথেষ্ট। অর্থাৎ পূর্বে ব্যায়াম করে নি এমন ব্যক্তিকে অবশ্যই প্রাথমিকভাবে খুব হালকা ব্যায়ামের মাধ্যমে শুরু করতে হবে।

নিয়মিত শরীরচর্চার উপকার

এইচ ডি এল বাড়ানো এবং এল ডি এল কমানো ছাড়াও নিয়মিত শরীরচর্চায় আরো অনেক সুবিধা আপনি পেতে পারেন।

- আপনার হার্টের সামগ্রিক সুস্থতার জন্য এটা ভালো।
- নিয়মিত শরীরচর্চা করলে আপনার ওজন নিয়ন্ত্রণ করা সহজ।
- শারীরিকভাবে কর্মঠ থাকলে খাদ্য তালিকা পছন্দ করা সহজ হয়ে যায়।
- সুন্দর লাগবে।
- শারীরিকভাবে কর্মঠ থাকলে আপনি আত্মবিশ্বাসী হবেন।
- হতাশা এবং স্ট্রেস কাটানোর জন্য শরীরচর্চা একটা উত্তম পদ্ধতি।
- আপনি আরো বেশি এনার্জি পাবেন।
- আর নিশ্চয়ই এটা মজাদার একটা অভিজ্ঞতা।

হৃদরোগে আক্রান্ত রোগীদের ব্যায়ামের নিয়মাবলী

যারা করোনারি আর্টারি ডিজিস বা হৃদরোগে ভুগছেন তাদের ব্যায়ামের প্রকৃতি, তীব্রতা বা সময়কাল কতটুকু হবে তা ই.টি.টি. বা ট্রেডমিল টেস্ট (Treadmill test) - এর ফলাফলের উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করবেন একজন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ। তবে সাধারণত স্ট্যাবল এনজাইনা পেক্টরিস (Stable Angina Pectoris)-এর রোগীরা ক্রমবর্ধমান ব্যায়ামের মাধ্যমে উপকৃত হয়ে থাকে। তবে এক্ষেত্রে তাদের নির্ধারিত ওষুধ নিয়মিত চালিয়ে যেতে হবে। ব্যায়াম অবশ্যই প্রাথমিক অবস্থায় হালকাভাবে শুরু করে পর্যায়ক্রমে তীব্রতা বাড়াতে হবে এবং যতটুকু পর্যন্ত গেলে বুকে ব্যথা বা শ্বাসকষ্ট হয় তার পূর্বেই ব্যায়ামের মাত্রা কমিয়ে তা শেষ করতে হবে। হৃদরোগীদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, চিকিৎসক কর্তৃক নির্ধারিত মাত্রার চেয়ে বেশি ব্যায়াম করা সমীচীন নয়। সদ্য হার্ট অ্যাটাক হয়েছে এমন রোগীদের অথবা যাদের হার্টের এনজিওপ্লাস্টি (PTCA) এবং বাই-পাস অপারেশন (CABG) হয়েছে তাদেরকেও হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ/ কার্ডিয়াক সার্জনের পরামর্শ মতো নির্ধারিত ব্যায়াম শুরু করতে হবে।

দ্রুত হাঁটা, জগিং-এর মতোই উপকারী

আপনাকে দৌড়াতে হবে না। নিয়মিত দ্রুত হাঁটুন পার্কে কিংবা বাড়ির আশেপাশে অথবা হাঁটার যন্ত্রের উপর–এটাই আপনার হার্টকে সুস্থ রাখার জন্য যথেষ্ট। সম্প্রতি এক সমীক্ষায় উপরোক্ত মন্তব্য করা হয়েছে। এতে দেখা যায়, সপ্তাহে মোটামুটিভাবে দু থেকে তিন ঘন্টা হালকা ব্যায়াম করলেই হৃদরোগের ঝুঁকি অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব। যা কিনা পূর্বের বিভিন্ন সমীক্ষার ফলাফল সমর্থন করে।

প্রায়ই আমাদের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় যে, কমপক্ষে কতটুকু হাঁটলে আমরা ব্যায়ামের সুবিধা পেতে পারি যা শরীর সুস্থ রাখতে সহায়তা করে? তাদের এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়–যদি সপ্তাহে গড়ে ১২ মাইল হাঁটা যায় তবে এই হাঁটা থেকেই ব্যায়ামের সুবিধাগুলো পাওয়া যাবে। এটা আজ পরীক্ষিত সত্য। সম্প্রতি ডিউক ইনস্টিটিউট মেডিক্যাল সেন্টার পরিচালিত এক সমীক্ষার ফলাফলে প্রমাণিত হয়েছে যে, যারা মোটা বা যাদের শারীরিক ওজন স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি এবং শারীরিক শ্রমের সাথে সম্পৃক্ত নয়, এদের জন্য সপ্তাহে কমপক্ষে ১২ মাইল হাঁটা নিঃসন্দেহে একটি সুন্দর ও সম্ভাবনাময় ব্যায়াম। এই ব্যায়ামের মাধ্যমে অবশ্যই তারা উপকৃত হবেন।

পূর্ববর্তী সমীক্ষাগুলোতে দেখা গেছে, সাধারণত যারা কোনো প্রকার ব্যায়াম করেন না কিন্তু নিয়মিত একই ধরনের খাবার খেয়ে যাচ্ছেন, এক বছর পর তাদের ওজন গড়ে ৩-৪ পাউন্ড বেড়ে যায়। সুতরাং আপনার যদি মনে হয় ব্যায়াম করে আপনি তেমন কোনো উপকার পাচ্ছেন না, কারণ আপনার ওজন আগের মতই আছে, একটুও কমেনি, তবুও আপনার প্রতি পরামর্শ হলো–ব্যায়াম বন্ধ করবেন না কারণ ওজন তো বাড়েনি।

এটাতো সবাই স্বীকার করবেন যে, একেবারে অলস বা শারীরিক শ্রমবিহীন থাকার চেয়ে অল্প হলেও শারীরিক পরিশ্রম করা উচিত–কেননা এতে তাৎক্ষণিক কোনো উপকার চোখে না পড়লেও শরীরের বা হার্টের উপরে এর সুদূরপ্রসারী সুফল অবশ্যই আছে। চল্লিশ হাজারেরও বেশি মধ্যবয়সী মানুষের মধ্যে পরিচালিত এক জরিপেও উপরোক্ত বক্তব্যের সমর্থন মেলে।

ব্যায়াম কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণ করে আপনার হৃদপিণ্ডকে ক্ষতি হওয়া থেকে রক্ষা করে। নতুন এক গবেষণায় দেখা গেছে, মাঝারি ধরনের ব্যায়াম কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। গবেষকরা দেখেছেন যে, মাঝারি ধরনের ব্যায়াম শরীরে কোলেস্টেরল বহনকারী লাইপোপ্রোটিনের আকৃতি ও সংখ্যার পরিবর্তন ঘটায়। সামান্য পরিমাণ কোলেস্টেরল যা একটি চর্বির মতো বস্তু তা শরীরের স্বাভাবিক কাজে সাহায্য করে। তবে অতিরিক্ত কোলেস্টেরল ধমণীগুলোতে রক্ত সঞ্চালনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে ফলে এ পরিস্থিতি মোকাবেলায় হৃদপিণ্ডকে অতিরিক্ত কাজ করতে হয়। এ ক্ষেত্রে স্বল্প পরিমাণ ব্যায়াম দারুণ উপকারী।

সুতরাং, আপনার শারীরিক সুস্থতার জন্যে তো বটেই এমনকি আপনার হার্টকে সুস্থ রাখতে অর্থাৎ হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে হালকা বা পরিমিত ব্যায়ামই যথেষ্ট। তবে অতিরিক্ত কিছু সুফল পেতে হলে ব্যায়ামের সময় এবং তীব্রতা বিশেষ ক্ষেত্রে বাড়ানো যেতে পারে।

সেই সাথে আরেকটি বিষয়ে প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে–ব্যায়াম করা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো, তবে জায়গা বুঝে ব্যায়াম না করলে তা হতে পারে রোগের কারণ। মূলত যারা বদ্ধঘরে ব্যায়াম করেন তারা অক্সিজেন স্বল্পতার দরুণ হৃদপিণ্ড এবং রক্তনালীর সমস্যাতে ভুগতে পারেন।

বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, বদ্ধঘরে ব্যায়াম করলে বাহ্যিক ক্ষতি না হলেও কোষীয় পর্যায়ে ক্ষতি সাধিত হয়। মূলত মাইটোকন্ড্রিয়াতেই ক্ষতি বেশি হয়ে থাকে। দেখা যায় জিমনেসিয়ামগুলোর বেশির ভাগই বদ্ধ।

তাই, সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী হবার জন্য এবং হার্টকে সুস্থ রাখতে আলো-বাতাসপূর্ণ খোলা স্থানে দ্রুত হাঁটার মাধ্যমে ব্যায়াম করা উচিত।

ধূমপান ও হৃদরোগ

ধূমপান যে ক্ষতিকর তা পঞ্চাশ বছর আগেও আমাদের জানা ছিল না। ১৯৫১ সালে ইংল্যান্ডের দুজন চিকিৎসক সে দেশের ৩৫ বছরের ৪০,০০০ ডাক্তারের কাছে এক প্রশ্নাবলি পাঠান। তাঁরা তখনও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ছিলেন না, কিন্তু তাঁরা লক্ষ্য করেছিলেন, যাঁরা ধূমপায়ী, তাঁদের মধ্যে ফুসফুস ও হার্টের বিশেষ ধরনের রোগ দেখা যাচ্ছে। ওই দুজন ডাক্তার ডল ও হিল ইংল্যান্ডের চিকিৎসকদের কাছে জানতে চেয়েছিলেন, তাঁদের ধূমপানের অভ্যাস আছে কিনা। থাকলে দিনে গড়ে কটি সিগারেট খান, কত বছর ধূমপান করছেন? তাঁরা চুরুট খান, না পাইপ খান? সেই সঙ্গে জানতে চাওয়া হয়েছিল তাঁদের শ্বাসযন্ত্রে কোনও রোগ আছে কিনা অথবা ওই সময়ে না থাকলেও পরে যদি রোগ হয় তা জানাতে ডাক্তারদের পরিবারবর্গের কাছে অনুরোধ করা হয়েছিল। তাঁদের আত্মীয়রা ওই চিকিৎসকদের মৃত্যু হলে কী রোগে তাঁর মৃত্যু হয়েছে তা যেন ডা. ডল ও ডা. হিলকে জানান। এটা অনস্বীকার্য যে, ইংল্যান্ডের চিকিৎসক সমাজ ও তাঁদের আত্মীয়রা এই ডাকে সাড়া দিয়ে ধূমপানের কুফল সম্বন্ধে জ্ঞান লাভে আমাদের সাহায্য করেছিলেন।

সেই সময়ে পৃথিবীর বিজ্ঞানী মহলে একটা সাড়া জাগাল। বিশ্বের নানা দেশে গবেষণা আরম্ভ হলো। তখন ইংল্যান্ডের ডাক্তাররা অনেকেই ধূমপান ছাড়তে আরম্ভ করলেন, কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে ধূমপানের প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে দেখা গেল। পরে দেখা গেল ১৯৫৪ থেকে ১৯৬৫ সালে সে দেশের পুরুষ ডাক্তারদের মধ্যে ফুসফুসের ক্যানসারে মৃত্যু হার ৩৮% কমে গেল এবং একই সময়ে সাধারণ মানুষদের মধ্যে ফুসফুসের ক্যানসারে মৃত্যুর হার ৭% বৃদ্ধি পেল।

একথা আজ পরীক্ষিত সত্য যে, ধূমপায়ীদের হৃদরোগের সম্ভাবনা অধূমপায়ীদের তুলনায় তিন থেকে পাঁচগুণ বেশি। সিগারেট, বিড়ি, চুরুট ইত্যাদি তামাকের ধোঁয়ায় যে নিকোটিন থাকে, তা হৃদপিণ্ডসহ শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের প্রচুর ক্ষতি করে। এই নিকোটিন রক্তে কার্বক্সি হিমোগ্লোবিন-এর পরিমাণ বহুলাংশে বাড়িয়ে দেয়। ফলে রক্তে এইচ ডি এল বা ভালো কোলেস্টেরল-এর পরিমাণ কমে যায়। এছাড়া নিকোটিন ধমনীর স্পন্দন বাড়িয়ে দেয়, ফলে ধমনীর ভিতরের রাস্তা ছোট হয়ে যায়, ফলে রক্তচাপ বেড়ে গিয়ে হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়।

অধূমপায়ীদের থেকে ধূমপায়ীদের হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যুর হার ৭০ শতাংশ বেশি। এছাড়া ধূমপায়ীদের Sudden death অর্থাৎ হঠাৎ মৃত্যুর সম্ভাবনাও অনেক বেশি।

সাধারণত একজন ব্যক্তি ধূমপান শুরু করে তার কৈশোর জীবনে। পশ্চিমা বিশ্বের মতো আমাদের দেশেও দেখা যাচ্ছে ধূমপানের প্রাদুর্ভাব তরুণ সমাজেই বিস্তার লাভ করেছে। যত কমবয়সে ধূমপান শুরু করে হৃদরোগের সম্ভাবনা বা ঝুঁকি বাড়ে তত বেশি। নিজে অধূমপায়ী হলেও ধূমপায়ীদের আশে-পাশে অবস্থানের কারণে হৃদরোগের ঝুঁকি বেড়ে যায় শতকরা ৩০ ভাগ। এই মরণছোঁয়া শিশুদের দিকেই আগে হাত বাড়াতে থাকে। পৃথিবীর অর্ধেকেরও বেশি শিশু Passive smoking বা পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হচ্ছে যেহেতু বাড়িতে তাদের বসবাস করতে হচ্ছে ধূমপায়ী পিতামাতা বা আত্মীয় স্বজনদের সাথে।

তাছাড়া একজন অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু বা কিশোর তার যেকোনো বয়সেই ধূমপান শুরু করতে পারে। ফলে ওই শিশু পরবর্তীতে ধূমপানজনিত রোগের একটি বড় ধরনের ঝুঁকির সম্মুখে থাকে। এদের মধ্যে অর্ধেক শিশু-কিশোর ক্রমান্বয়ে ধূমপান চালিয়ে যেতে থাকে, যা তাদের বার্ধক্যে মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ ধূমপানের ফলে তারা ভবিষ্যতে আক্রান্ত হয় করোনারি বা ইস্কেমিক হার্ট ডিজিস, উচ্চ রক্তচাপ, স্ট্রোক, হাঁপানী, যক্ষা, ফুসফুসের ক্যানসার, পেপটিক আলসার ইত্যাদি নানা জটিল রোগে। একজন অনেকদিনের ধূমপায়ীর মৃত্যুর শতকরা ৫০ ভাগ কারণ সিগারেটের সাথে নিকোটিন সেবন এবং বাকি শতকরা ৫০ ভাগ হয়ে থাকে ধূমপান জনিত হৃদরোগের কারণে।

সমস্ত রোগের (হৃদরোগ, ক্যানসার, বক্ষব্যাধি) কারণ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, আগামী ২০২০ সালে ধূমপানই হবে মৃত্যুর প্রধান কারণ। আগামী ২০২০ সাল নাগাদ আশংকা করা হচ্ছে বাৎসরিক ৮৪ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হবে কেবল মাত্র ধূমপানের ফলে। পক্ষান্তরে ১৯৯০ সালে এই মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ৩০ লক্ষ। সম্প্রতি বিশ্বব্যাপী ১৪০০০ মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন বা হার্ট অ্যাটাকের রোগীদের মধ্যে পরিচালিত এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, হৃদরোগের অন্যতম প্রধান ঝুঁকির কারণ ধূমপান, যা কিনা শতকরা ৪০ ভাগ। এর পরবর্তী স্থানে আছে যথাক্রমে উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস এবং কোলেস্টেরল। ধূমপান ও জন্ম নিয়ন্ত্রণের বড়ি একসাথে গ্রহণ করলে হৃদরোগ এবং স্ট্রোকের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, দৈনিক ১৫টি সিগারেট এবং তার সাথে জন্ম নিয়ন্ত্রণের বড়ি খেলে হৃদরোগের সম্ভাবনা বাড়ে ৩-৫ গুণ আর দৈনিক ১৫টির বেশি সিগারেট খেলে এই ঝুঁকি বেড়ে যায় ২০ গুণ। এর বিশেষ প্রভাব পড়ে গর্ভে থাকাকালীন শিশুর উপর। যা ভবিষ্যতে তার জন্য ক্ষতি বয়ে আনে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-এর সমীক্ষায় বলা হয়েছে, ধূমপান ছেড়ে দেয়ার ১ বছরের মধ্যে হৃদরোগের ঝুঁকি কমে ৫০ শতাংশ আর ১৫ বৎসর পর এই ঝুঁকি কমে হয় অধূমপায়ীদের মতো। ঠিক একই রকম স্ট্রোকের ক্ষেত্রেও ধূমপান ছেড়ে দেয়ার ৫ বছর পর ঝুঁকির পরিমাণ অধূমপায়ীদের তুলনায় বেশি নয়।

ধূমপানজনিত ঝুঁকির মাত্রা নিরূপণ

প্রথম সুযোগেই রোগীর ধূমপানের পরিমাণ কোন পর্যায়ে আছে তা নির্ধারণ করে নেয়া উচিত এবং এক্ষেত্রে রোগীকে নিম্নলিখিত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে এ পর্যায় সহজেই নির্ণয় করা সম্ভব–

১. আপনি কি বর্তমানে একজন ধূমপায়ী?
২. বর্তমানে ধূমপায়ী হলে দৈনিক সিগারেট বা তামাকের পরিমাণ কত?
৩. কত দিন থেকে ধূমপান করছেন?
৪. পূর্বে ধূমপান বন্ধের জন্য কোনো চেষ্টা করেছেন কি না?
৫. ধূমপান বন্ধ করে থাকলে তা কতদিন আগে করেছেন?

ধূমপান নিয়ন্ত্রণের উপায়

ধূমপান ত্যাগ করা একটি জটিল এবং কঠিন প্রক্রিয়া। কারণ ধূমপান একটি মারাত্মক আসক্তি, যা শরীর এবং মন উভয়ের উপরই বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। ধূমপান ত্যাগে চিকিৎসকের পরামর্শের পাশাপাশি রোগীর আত্মোপলব্ধি এবং সদিচ্ছাই হচ্ছে প্রাথমিক ধাপ। এর সাথে নিম্নলিখিত পরামর্শগুলো ধূমপান ত্যাগে সহায়তা করবে।

- ধূমপান সম্পর্কিত বাস্তবচিত্র আপনার শিশুর সামনে তুলে ধরুন।
- স্বাস্থ্যের উপর ধূমপানের ক্ষতিকর প্রভাবগুলো নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করুন।
- যে বয়সে শিশুরা সাধারণত ধূমপানের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকে তার আগেই তাদের সাথে আলোচনা করুন।
- সিগারেট কোম্পানিগুলোর বাহারি বিজ্ঞাপনে প্রভাবিত হবেন না এবং সিগারেটের বিজ্ঞাপনের প্রচার বন্ধের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।
- সর্বোপরি শিশুর বাবা-মা হিসেবে আপনি/আপনারা যদি ধূমপায়ী হন তবে চেষ্টা করুন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ধূমপান পরিহার করতে।

- স্ত্রীর সহায়তার পাশাপাশি পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সহায়তাও একজন ধূমপায়ীর ধূমপান ত্যাগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করতে হবে।
- ধূমপান ত্যাগের প্রাথমিক পর্যায়ে ধূমপানের বিকল্প হিসেবে নিকোটিন চুইংগামের ব্যবহার উন্নত দেশগুলোতে বেশ কয়েক বছর ধরে চলে আসছে এবং এর সফলতার হারও আশাব্যঞ্জক। যদিও আমাদের দেশে এর ব্যবহার নেই বললেই চলে।
- অতি সম্প্রতি আমাদের দেশে ধূমপান নেশা ত্যাগে সহায়ক কিছু ওষুধও পাওয়া যাচ্ছে। যথাযথ চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী তা গ্রহণ করলে সুফল পাওয়া সম্ভব।
- ধূমপান মুক্ত পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। বিশেষ করে অফিস-আদালত বা কর্মস্থল, পার্ক, সিনেমা হল, রেস্টুরেন্ট, যানবাহন, দর্শনীয় স্থান, রেলস্টেশন, বাসটার্মিনাল, লঞ্চঘাট ইত্যাদি জনবহুল এলাকাগুলোকে ধূমপান মুক্ত এলাকা হিসেবে ঘোষণা দেয়া এবং তা সঠিকভাবে মেনে চলা। এ দায়িত্ব সরকারের কিন্তু সাধারণ জনগণকে সহযোগিতায় এগিয়ে আসতে হবে।
- তামাক এবং ধূমপান হার্ট-অ্যাটাকের সম্ভাবনা সাধারণভাবে দ্বিগুণ করে। তাই নিজে তামাক এবং ধূমপান থেকে বিরত থাকুন এবং আপনার চারপাশ তামাক ও ধূমপান মুক্ত রাখুন এবং হৃদরোগমুক্ত সুস্থ জীবন গড়ে তুলুন।

ডায়াবেটিস ও হৃদরোগ

ডায়াবেটিস (বিশেষ করে টাইপ-II) যা সাধারণত বয়স্কদের মধ্যে হয়ে থাকে, এর প্রাদুর্ভাব সারাবিশ্বেই দিনে দিনে বাড়ছে। বয়স বৃদ্ধি, কর্মক্ষমতা হ্রাস এবং অনিয়ন্ত্রিত খাদ্যাভ্যাস (বিশেষ করে অতিরিক্ত খাদ্যগ্রহণ) ডায়াবেটিসের মূল কারণ। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, আগামী ২০২৫ সালে ডায়াবেটিক রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াবে ৩০০ মিলিয়নে। যা নাকি পৃথিবীর জনসংখ্যার শতকরা ৫.৪ ভাগ। বর্তমানে হৃদরোগে যত মৃত্যু হয় তার শতকরা ১.৪ ভাগ মৃত্যুর জন্য দায়ী ডায়াবেটিস এবং দুঃখজনক হলেও সত্য যে এই মৃত্যুহার ভবিষ্যতে আরও বৃদ্ধি পাবে। ডায়াবেটিস এবং করোনারি হার্ট ডিজিস বা হৃদরোগ একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। করোনারি হার্ট ডিজিসে আক্রান্ত রোগীদের শতকরা ২৮ জনের ডায়াবেটিস আছে। আর অ্যাকিউট করোনারি সিনড্রম (Acute Coronary Syndrome) রোগীদের শতকরা ৭০ জনের রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ অস্বাভাবিক। অন্য এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, Acute Myocardial Infarction রোগীদের মধ্যে শতকরা ২০-২৫ জনেরই ডায়াবেটিস আছে। ডায়াবেটিস (টাইপ-II) অনেক আগে থেকেই হৃদরোগের অন্যতম কারণ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। ডায়াবেটিস পুরুষ এবং নারী উভয়েরই হৃদরোগের অন্যতম ঝুঁকির বিষয়। তবে মহিলাদের জন্য ঝুঁকির পরিমাণ বেশি। ডায়াবেটিক নারীর হৃদরোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা ৮ গুণ বেশি, ডায়াবেটিক পুরুষদের ক্ষেত্রে যা মাত্র ৩ গুণ। সুতরাং ডায়াবেটিস যেমন নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে তারচেয়েও বেশি সতর্ক থাকতে হবে ডায়াবেটিস প্রতিরোধে।

১. হৃদরোগের ঝুঁকি নির্ণয়ে রক্তে গ্লুকোজ এবং HbA_1C-এর মাত্রাই মুখ্য

সাম্প্রতিক বিভিন্ন নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে, হৃদরোগের ঝুঁকি শুধুমাত্র ডায়াবেটিসের উপস্থিতির উপরই নির্ভর করে না। বরং রক্তে গ্লুকোজ এবং হৃদরোগের ঘটনার আন্তঃসম্পর্কটাকে এভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যেমন–রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ স্বাভাবিক অবস্থা থেকে ডায়াবেটিসের পর্যায়ে প্রবেশ করা বা এই মাত্রা বাড়ার সাথে

সাথে হৃদরোগের ঝুঁকিও বাড়তে থাকে। ১৯৯৮ সালে ডায়াবেটিস নাই এমন জনগোষ্ঠীর মধ্যে এক বড় ধরনের সমীক্ষায় দেখা গেছে খাওয়ার ২ ঘন্টা পরে যাদের রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ শতকরা ৪.২ মিলিমোল (4.2 mmol/l) তাদের তুলনায় যাদের রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ শতকরা ৭.৮ মিলিমোল (7.8 mmol/l) তাদের মধ্যে হৃদরোগের ঘটনা শতকরা ৫৮ ভাগ বেশি।

রক্তে গ্লুকোজের পাশাপাশি গ্লাইসেটেড হিমোগ্লোবিন বা HbA_1C -এর পরিমাণও হৃদরোগের ঝুঁকি নির্ধারণে বড় ভূমিকা রাখে। সাম্প্রতিক United Kingdom Prospective Diabetes Studies (UKPDS)-এর নিরীক্ষায় দেখা গেছে, শতকরা ১ ভাগ HbA_1C বাড়ার সাথে সাথে হার্ট অ্যাটাকের হার বাড়ে শতকরা ১৪ ভাগ, স্ট্রোকের হার বাড়ে শতকরা ১২ ভাগ এবং কনজেসটিভ হার্ট ফেইলিউর (CHF) বাড়ে শতকরা ১৬ ভাগ।

১. অভুক্ত অবস্থার চেয়ে খাওয়ার পর রক্তে গ্লুকোজ হৃদরোগের ঝুঁকি নির্ধারিণে বেশি ভূমিকা রাখে–

- সাম্প্রতিক কালের বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, অভুক্ত অবস্থার চেয়ে খাওয়ার পর রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা HbA_1C-এর মাত্রার সাথে বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ।
- খাওয়ার পর রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা অভুক্ত অবস্থার চেয়ে বেশি থাকে।
- অভুক্ত অবস্থায় গ্লুকোজের মাত্রা হৃদরোগ সংক্রান্ত রোগের সাথে ততটা সম্পর্কিত নয় যতটা সম্পর্কিত খাওয়ার পরে গ্লুকোজের মাত্রা।
- সম্প্রতি অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে, ডায়াবেটিসহীন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে যাদের হার্ট অ্যাটাকের সময় গ্লুকোজের মাত্রা বেশি থাকে, তাদের হাসপাতালে অবস্থানকালে মৃত্যুর হার চারগুণ বেশি।
- অন্য আরেক গবেষণায় দেখা গেছে যে, খাওয়ার পরে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা ক্যারোটিড অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস (Atherosclerosis) এবং হৃদরোগের ঝুঁকির সাথে অধিক সম্পর্কিত।

সুতরাং রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা এবং HbA_1C -এর মাত্রাবৃদ্ধি নতুন করে হৃদরোগের ঝুঁকি যেমন বাড়ায় তেমনি হৃদরোগের পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনাও বাড়িয়ে দেয় এবং এই আন্তঃসম্পর্ক ডায়াবেটিসের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির সাথে সম্পর্কিত নয়।

ডায়াবেটিস নির্ণয়ের উপায়সমূহ

১. ডায়াবেটিসের লক্ষণসমূহ (অতিরিক্ত প্রস্রাব হওয়া, অতিরিক্ত ক্ষুধা, ওজন কমে যাওয়া) এবং যে কোনো সময়ে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ 200mg/dl (11.1 mmol/l) বা এর বেশি।

অথবা

২. অভুক্ত অবস্থায় রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ অর্থাৎ FPG (Fasting Plasma Glucose) ১২৬ mg/dl এখানে অভুক্ত বলতে কমপক্ষে ৮ ঘন্টা কোনরকম ক্যালরিযুক্ত খাবার খাওয়া থেকে বিরত থাকা বোঝায়।

অথবা

৩. WHO বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী ৭৫ গ্রাম গ্লুকোজ খাওয়ার ২ ঘন্টা পর রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ।

অর্থাৎ 2-h plasma glucose 200mg/dl (11.1mmol/l)

ডায়াবেটিসের লক্ষণ নাই এমন ব্যক্তিদের ডায়াবেটিস পরীক্ষার নিয়মাবলী

- ৪৫ বছরের উর্দ্ধে ব্যক্তিদের ডায়াবেটিসের পরীক্ষা করা উচিত।
- যাদের মধ্যে বি.এম.আই. ২৫ কে.জি./ মি.^{2}
- কমবয়সের ব্যক্তিদের যাদের অতিরিক্ত ওজন (বি.এম.আই.২৫ কে.জি./মি.^{2})

নিম্নের লক্ষণজনিত ব্যক্তিগণ এই রোগের ঝুঁকির সম্মুখীন

- স্বভাবগতভাবে অলস।
- যাদের নিকট আত্মীয়রা ডায়াবেটিসে আক্রান্ত।
- অত্যধিক ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার বসবাসরত জনগোষ্ঠী (ইউরোপ, আফ্রিকা এবং এশিয়া)।
- যে সমস্ত গর্ভবতী মহিলাগণ ৯ পাউন্ড বা তার অধিক ওজনের শিশু প্রসব করেছেন।
- যাদের রক্তচাপ 140/90 mmHg বা তার বেশি।
- যাদের অধিক ঘন বা HDL কোলেস্টেরল <35 mg/dl (0.90 mmol/l) এর নিচে এবং/অথবা ট্রাইগ্লিসারাইড >250mg/dl (2.82 mmol/l)-এর উপরে।

- যারা পলিসিস্টিক ওভারি সিনড্রোম/Polycystic Ovary Syndrome(PCOS)-এ ভুগছেন।
- রক্ত পরীক্ষায় যাদের IGT অথবা IFG ধরা পড়েছে।
- ইনসুলিন রেজিস্টেন্সের সাথে সম্পর্কিত শারীরিক অবস্থা থাকলে।
- যাদের রক্তনালীর রোগ আছে।

ডায়াবেটিস প্রতিরোধ অথবা বিলম্বিত করার উপায়সমূহ

সাধারণত দুই উপায়ে এটি প্রতিরোধ করা সম্ভব

১. জীবন ধারার পরিবর্তন (Lifestyle modification)

২. ঔষধ প্রয়োগের মাধ্যমে (Pharmacological interventions) তবে সহজভাবে নিম্নলিখিত নির্দেশাবলী মেনে চললে ডায়াবেটিস প্রতিরোধ অথবা বিলম্বিত করা সম্ভব। যেমন–

- যারা ডায়াবেটিস হওয়ার ঝুঁকির মধ্যে আছে, তাদেরকে ওজন কমানোর বা নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম হয় এমন কাজ করার সুফল সম্পর্কে সচেতন করতে হবে।
- IGT (Impaired Glucose Tolerance) রোগীদের ওজন কমানোর পরামর্শ দিতে হবে এবং সেই সাথে ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রমে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।
- যারা IFG (Impaired Fasting Glucose)–তে ভুগছেন তাদেরকেও ওজন কমাতে এবং ব্যায়াম বা শারীরিক শ্রম বাড়াতে পরামর্শ দিতে হবে।
- উপরোক্ত পরামর্শগুলো সঠিকভাবে পালিত হচ্ছে কিনা তা পর্যালোচনার জন্য নিয়মিত একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।
- প্রতি ১ বা ২ বছর অন্তর অন্তর ডায়াবেটিস আক্রান্ত হচ্ছে কিনা তা পরীক্ষা করতে হবে।
- হৃদরোগের অন্যান্য ঝুঁকিসমূহ যেমন–ধূমপান, উচ্চ রক্তচাপ এবং রক্তে উচ্চমাত্রার কোলেস্টেরল-এর পরিমাণ নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং প্রয়োজনে এর চিকিৎসা করতে হবে।
- ডায়াবেটিস প্রতিরোধে নিয়মিত ঔষধ ব্যবহার করা ঠিক নয়। অবশ্য ভবিষ্যতে ঔষধ ব্যবহারের উপকারিতা সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্যের উপর এই সিদ্ধান্তের ব্যত্যয় নির্ভর করবে।

JNC-VII (Seventh Report of The Joint National Committee) রিপোর্ট অনুযায়ী উচ্চ রক্তচাপের সংজ্ঞা বা প্রকারভেদকে নিম্নলিখিতভাবে দেখানো হয়েছে–

প্রকারভেদ	সিস্টোলিক	ডায়াস্টোলিক
স্বাভাবিক	< ১২০	< ৮০
অতিরিক্ত স্বাভাবিক	১২০-১৩৯	৮০-৮৯
গ্রেড-১ উচ্চ রক্তচাপ	১৪০-১৫৯	৯০-৯৯
গ্রেড-২ উচ্চ রক্তচাপ	≥ ১৬০	≥ ১০০
আইসোলেটেড সিস্টোলিক হাইপারটেনশন	≥ ১৪০	< ৯০

স্থান কাল পাত্র ভেদে উচ্চ রক্তচাপ মাত্রা নির্ধারণ

অনেক সময় ডাক্তার ভীতি বা হাসপাতাল ভীতি ডাক্তারের চেম্বারে রোগীর রক্তচাপের উপর প্রভাব ফেলে। অর্থাৎ সাময়িকভাবে রক্তচাপ বেড়ে যেতে পারে, যাকে 'হোয়াইট কোট হাইপারটেনশান' বলা হয়ে থাকে। তবে পরবর্তী সময়ে প্রতিবার ভিজিটের সময়ই যদি প্রেসার বেশি পাওয়া যায় (>১৪০/৯০) তবে তা অবশ্যই আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা যেমন ২৪ ঘন্টা এম্বুলেটরি প্রেসার মনিটরিং এর সাহায্যে রক্তচাপ মেপে দেখতে হবে। স্বাভাবিকভাবে দিনের বেলা থেকে রাতে প্রেসার কিছু কম থাকে।

স্থান-কাল পাত্র ভেদে হাইপারটেনশানের সংজ্ঞা নির্ণয়ে রক্তচাপের মাত্রা উচ্চ রক্তচাপ হওয়ার ঝুঁকিসমূহ–

	সিস্টোলিক ব্লাড প্রেসার	ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেসার
ডাক্তার চেম্বার বাকিনিক	১৪০	৯০
২৪ ঘন্টা এম্বুলেটরি	১২৫	৮০
মনিটরিং বাড়িতে	১৩৫	৮৫

- অতিরিক্ত ওজন থাকলে।
- শারীরিক পরিশ্রম কম করলে।
- অতিরিক্ত লবণ এবং চর্বিযুক্ত (প্রাণিজ চর্বি) খাবার খাওয়ার অভ্যাস থাকলে।
- অতিরিক্ত মদ্যপান করলে।

- পরিবারের সদস্যদের মধ্যে কারো যদি উচ্চ রক্তচাপ অথবা হৃদরোগের পূর্ব ইতিহাস থাকে।
- পরিবারের সদস্যদের মধ্যে কারো যদি উচ্চমাত্রায় কোলেস্টেরলের পূর্ব ইতিহাস থাকে।
- পরিবারের সদস্যদের মধ্যে কারো যদি ডায়াবেটিসের পূর্ব ইতিহাস থাকে।
- ধূমপানের অভ্যাস থাকলে।
- জন্মনিয়ন্ত্রণের বড়ি খেলে।
- টেনশনে ভুগলে।
- পরিবারের সদস্যদের মধ্যে কারো যদি পলিসিস্টিক কিডনি রোগের পূর্ব ইতিহাস থাকে।
- মূত্রনালীতে প্রদাহ থাকলে।
- কিছু কিছু ঔষধ সেবনেও রক্তচাপ বাড়তে পারে।

উচ্চ রক্তচাপ রোগীদের হৃদরোগ সম্ভাবনার ঝুঁকিসমূহ

১.	রক্তচাপের মাত্রা	সিস্টোলিক ডায়াস্টোলিক	> ১৪০ মিমি মারকারি > ৯০ মিমি মারকারি
২.	বয়স	পুরুষ, মহিলা	> ৫৫ বছর > ৬৫ বছর
৩.	ধূমপান		
৪.	ডিসলিপিডিমিয়া	মোট কোলেস্টেরল এল.ডি.এল. কোলেস্টেরল এইচ.ডি.এল কোলেস্টেরল : পুরুষ মহিলা	> ২৫০ মি.গ্রা./ডি.এল > ১৫৫ মি.গ্রা./ডি.এল < ৪০ মি.গ্রা./ডি.এল < ৪৮ মি.গ্রা./ডি.এল
৫.	ডায়াবেটিস	অভুক্ত অবস্থায় রক্তে-গ্লুকোজের পরিমাণ (FPG) খাবারের পর রক্তে-গ্লুকোজের পরিমাণ (FPG)	৭ মিলিমোল/লিটার ১১ মিলিমোল/লিটার
৬.	অপরিণত বয়সে হৃদরোগের পারিবারিক ইতিহাস		
৭.	মেদভুঁড়ি	কোমড়ের মাপ : পুরুষ মহিলা	> ১২০ সে.মি. > ৮৮ সে.মি.
৮.	সি রিয়াকটিভ প্রোটিন	> ১ মি.গ্রা./ডি.এল	

উচ্চ রক্তচাপের লক্ষণ

সাধারণত জটিলতাবিহীন উচ্চ রক্তচাপ (Uncomplicated Hypertension)-এর ক্ষেত্রে তেমন কোনো লক্ষণ দেখা নাও যেতে পারে। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত উপসর্গ দেখা দিতে পারে। যেমন–

- মাথা ব্যথা (বিশেষ করে মাথার পিছন দিকে)
- মাথা ঘোরানো
- নাক দিয়ে রক্তপড়া
- ঘাড় ব্যথা
- ঘামানো
- শ্বাস কষ্ট

ব্লাড প্রেসার পরীক্ষার নিয়মাবলী

- উচ্চ রক্তচাপ পরীক্ষার প্রারম্ভে রোগীকে কয়েক মিনিট নিরিবিলি কক্ষে শান্তভাবে অবস্থান করতে হবে। কেননা হেঁটে বা সিড়ি বেয়ে উপরে উঠার কারণে রোগীর পরিশ্রম হয়। ফলে শরীরের রক্তচাপ স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে যেতে পারে।
- রক্তচাপ মাপার সময় কমপক্ষে দুইবার ১-২ মিনিট ব্যবধানে মাপ নেয়া ভালো। প্রথম দুইবার মাপের ক্ষেত্রে যদি রক্তচাপের তারতম্য দেখা যায় তবে ৩য় বার মাপ নেয়া যেতে পারে।
- রোগী যে অবস্থানেই থাকুক না কেন, রক্তচাপ পরিমাপের যন্ত্রের 'কাফ' রোগীর হার্টের লেবেলে রাখতে হবে। বর্তমানে কিছু ইলেট্রনিক্স যন্ত্র রোগীরা নিজেরাই ব্যবহার করে থাকেন। সেই সব যন্ত্রের ক্ষেত্রে 'কাফ' বাঁধা হয় কব্জিতে। সুতরাং তাদের ক্ষেত্রে কণুই ভাঁজ করে কব্জি হার্টের লেবেলে রাখতে হয়।
- প্রথমবার রক্তচাপ পরিমাপের ক্ষেত্রে রোগীর উভয় হাতেই মাপ নেয়া উচিত। কেননা বিভিন্ন রোগের কারণে দুই বাহুতে দুই রকম রক্তচাপ পাওয়া যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে তুলনামূলক উচ্চ মাত্রাকেই হিসেবে নিতে হবে।

উচ্চ রক্তচাপের কারণে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের ক্ষতি এবং এর সাথে সম্পর্কিত রোগ সমূহ :

১.	ব্রেইন/মস্তিষ্ক	স্ট্রোক/ক্ষণস্থায়ী ইস্কেমিক অ্যাটাক (TIA)
২.	হার্ট/হৃদযন্ত্র	লেফট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি/হার্ট অ্যাটাক/হার্ট ফেইলিওর
৩.	কিডনি	নেফ্রোপ্যাথি/কিডনি ফেইলিওর
৪.	চোখ	রেটিনোপ্যাথি
৫.	রক্তনালী	পেরিফেরাল ভাসকুলার ডিজিস

কখন চিকিৎসা প্রয়োজন

চল্লিশোর্ধ একজন স্বাভাবিক ব্যক্তির তুলনায় উচ্চ রক্তচাপ আছে এমন ব্যক্তির স্ট্রোকের সম্ভাবনা ৩০ গুণ বেশি থাকে। অনেক পূর্ব থেকেই লক্ষ্য করা হচ্ছে যে, যাদের উচ্চ রক্তচাপ আছে তাদের স্ট্রোক, হার্ট অ্যাটাক, হার্ট ফেইলিওর, কিডনি ফেইলিওর ইত্যাদি অনেক বেশি হচ্ছে এবং এর ফলে তাদের গড় আয়ুও কম।

কোন ব্যক্তির যদি সিস্টোলিক রক্তচাপ নিয়মিতভাবেই ১৮০ বা তার বেশি থাকে অথবা ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ ১১০ বা তার বেশি থাকে তবে কোনোরকম দ্বিধা ছাড়াই যত দ্রুত সম্ভব ঔষধ দিয়ে চিকিৎসা শুরু করা উচিত।

আবার এমন কোন ব্যক্তি যার মধ্যে হৃদরোগের একাধিক রিস্ক ফ্যাক্টর বিদ্যমান, পাশাপাশি যার সিস্টোলিক রক্তচাপ ১৪০ বা এর চেয়ে বেশি অথবা ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ ৯০ বা তার বেশি তবে তাকেও দ্রুত ঔষধ দিয়ে চিকিৎসা শুরু করতে হবে।

অপরদিকে যাদের রক্তচাপ ১৪০/৯০ বা তার বেশি আছে কিন্তু হৃদরোগের ঝুঁকির মাত্রা কম এবং যাদের টার্গেট অর্গানগুলো অক্ষত আছে তাদেরকে প্রথমে জীবনধারা পরিবর্তনের মাধ্যমে উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করতে হবে। প্রয়োজনে ঔষধের সাহায্যও নেয়া যেতে পারে।

তবে দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া যাদের সিস্টোলিক রক্তচাপ ১৪০ এর নীচে এবং ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ ৯০ এর নিচে তাদের ঔষধ দিয়ে চিকিৎসার দরকার নেই। এর পাশাপাশি একথাও মনে রাখতে হবে যে, রক্তচাপ কমানোর ঔষধ শুধু রক্তচাপই কমায় না, বরং অনেক ঔষধই হৃদরোগজনিত মৃত্যুর হার কমাতে সাহায্য করে।

প্রয়োজন–জীবনধারার পরিবর্তন

উচ্চ রক্তচাপ আক্রান্ত সকল রোগীর ক্ষেত্রেই চিকিৎসার পাশাপাশি নিজেদের জীবনধারার পরিবর্তন অত্যাবশ্যক। এর ফলে রোগীর উচ্চ রক্তচাপ কমে যাবে, অন্যান্য ঝুঁকি এবং চিকিৎসার অবস্থা নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

উচ্চ রক্তচাপ অথবা হৃদরোগ নিয়ন্ত্রণ নিম্নে বর্ণিত জীবনধারা পরিবর্তনের মাধ্যমেই সম্ভব–

- **ধূমপান ত্যাগ করা :** সমীক্ষায় দেখা গেছে, ধূমপানের ফলে সারা বিশ্বে প্রতি ৮ সেকেন্ডে একজন মানুষের মৃত্যু হয়। এভাবে বছরে প্রায় ৪০ লাখ মানুষ ধূমপানের প্রভাবেই মারা যায়। যদিও এককভাবে উচ্চ রক্তচাপের উপর ধূমপানের প্রভাব সামান্য কিন্তু সামগ্রিকভাবে ধূমপানের ফলে হৃদরোগের ঝুঁকি বহুলাংশে বেড়ে যায়। যারা মধ্য বয়সেই ধূমপান বর্জন করেছেন তাদের আয়ুষ্কাল অধূমপায়ীদের মতোই হয়ে থাকে এবং এই ধূমপান বর্জন উচ্চ রক্তচাপ/ হৃদরোগ/স্ট্রোক নিয়ন্ত্রণে একক শক্তিশালী ভূমিকা রাখে।
- **অতিরিক্ত মদ্যপান ত্যাগ করা :** অতিরিক্ত মদ্যপান উচ্চ রক্তচাপ বৃদ্ধি করে এবং স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। সুতরাং অতিরিক্ত মদ্যপান অবশ্যই ত্যাগ করা উচিত।
- **ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা :** অতিরিক্ত ওজনের ফলে স্বাভাবিক আয়ুষ্কাল গড়ে ৯ বছরের মতো কমে যায়। এছাড়া অতিরিক্ত শারীরিক ওজন হৃদরোগ, ডায়াবেটিক (টাইপ-II), উচ্চ রক্তচাপ, মাত্রাতিরিক্ত চর্বি এবং স্ট্রোকের অন্যতম কারণ এবং অতিরিক্ত ওজন এ সমস্ত রোগে মৃত্যুর ঝুঁকিও বহুলাংশে বাড়িয়ে দেয়। সমন্বিত খাদ্যাভ্যাসের মাধ্যমে অর্থাৎ চর্বিযুক্ত খাদ্যাভ্যাস পরিহার করে এবং শারীরিক পরিশ্রমের মাধ্যমে ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।
- **শারীরিক পরিশ্রম করা :** পৃথিবীর শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ লোক শারীরিক পরিশ্রম কম করে, বিশেষত মহিলারা। শারীরিক পরিশ্রম ওজন নিয়ন্ত্রণে এবং উচ্চ রক্তচাপ কমাতে বা প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে। সাধারণত মুক্তবায়ুতে প্রতিদিন ৩০-৪০ মিনিট করে সপ্তাহে ৫-৬ দিন ব্যায়ামই যথেষ্ট।

- **আলাদা লবণ পরিহার করা :** বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, সোডিয়াম ক্লোরাইড বা লবণ রক্তচাপ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। সুতরাং প্রতিদিন খাবারে লবণের পরিমাণ ৮০-১০০ মিলিমোল (৪.৭-৫.৮ গ্রাম) কমালে রক্তচাপ কমে গড়ে ৪-৬ মিমি মারকারি। তাই প্রতিদিনের খাবারে আলাদা লবণ এবং অতিরিক্ত লবণযুক্ত খাবার পরিহার করা উচিত।
- **টাটকা ফল এবং শাকসব্জি আহারের অভ্যাস করা :** পটাশিয়াম সমৃদ্ধ খাবার উচ্চ রক্তচাপ প্রতিরোধে সহায়ক ভূমিকা রাখে। আবার কম ক্যালসিয়াম যুক্ত খাবার উচ্চ রক্তচাপ বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখে। সুতরাং পটাশিয়াম এবং ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ টাটকা ফল এবং শাকসব্জি উচ্চ রক্তচাপ প্রতিরোধ করে।

শেষ কথা

রক্তচাপ কিছুটা কমলে হৃদরোগের এবং স্ট্রোকের ঝুঁকিও কমে। স্ট্রোক পরবর্তী বেঁচে যাওয়া উচ্চ রক্তচাপ সম্পন্ন রোগীদের মধ্যে পরিচালিত এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, প্রেসার কমানোর জন্য ঔষধের চিকিৎসায় স্ট্রোকের ঝুঁকি কমে শতকরা ২৯ ভাগ এবং এর পাশাপাশি হৃদরোগের সম্ভাবনাও বহুলাংশে কমে যায়। সুতরাং বিভিন্ন সমীক্ষায় এটা প্রমাণিত যে, উচ্চ রক্তচাপের সাথে স্ট্রোক, হৃদরোগ এবং হার্ট ফেইলিওরের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। আবার উচ্চ রক্তচাপ কিডনি রোগের কারণ এবং এর পরিণতি দুটোই অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরের জন্য দায়ী। কিডনি নষ্ট হওয়ার কারণে যাদের কিডনি প্রতিস্থাপন করা হয়েছে এমন রোগীদের ৮০-৯০ ভাগই উচ্চ রক্তচাপে ভুগছেন।

সুতরাং এ কথা পরিষ্কার যে, উচ্চ রক্তচাপ কিডনি রোগের ক্রমশ ব্যাপ্তি এবং শেষ পর্যন্ত কিডনি ফেইলিওরের জন্য প্রধান নির্ণয়ক।

অন্যদিকে ডায়াবেটিস রোগীদের বেলায় উচ্চ রক্তচাপের প্রকোপ, ডায়াবেটিস নেই এমন রোগীদের তুলনায় ১.৫-২ গুণ বেশি। ডায়াবেটিস এবং উচ্চ রক্তচাপের সহাবস্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার কেননা এরা ম্যাক্রোভাসকুলার এবং মাইক্রোভাসকুলার রোগের ঝুঁকি বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়। ফলশ্রুতিতে হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু, করোনারি হার্ট ডিজিস, কনজেসটিভ হার্ট ফেইলিওর, স্ট্রোক এবং ফেরিফেরাল ভাসকুলার ডিজিস-এর ঝুঁকি বেড়ে যায়।

সুতরাং উচ্চ রক্তচাপ যে একটি নীরব ঘাতক এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ-ই নেই। আসুন সবাই মিলে উচ্চ রক্তচাপ প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণে আরো বেশি করে সচেষ্ট হই। উচ্চ রক্তচাপ (সিস্টোলিক এবং ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ দুটোই) এবং

হৃদরোগের ঝুঁকির মধ্যে প্রত্যক্ষ এবং ধনাত্মক সম্পর্ক রয়েছে। অর্থাৎ রক্তচাপ বাড়লে হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়বে। এই সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর, নিবিড়, স্বাধীন এবং গুরুত্বপূর্ণ।

সুতরাং উচ্চ রক্তচাপ চিকিৎসার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে রোগী এবং ডাক্তার উভয়কেই রক্তচাপ-এর মাত্রার পাশাপাশি হৃদরোগের ঝুঁকিসমূহ এবং উচ্চ রক্তচাপের ফলে শরীরের যে সকল অঙ্গগুলো বা অরগান নষ্ট হয় তাদের বর্তমান অবস্থা এবং এদের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ককে অবশ্যই গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় রাখতে হবে। অর্থাৎ উচ্চ রক্তচাপের চিকিৎসার অর্থ শুধু ব্লাড প্রেসার কমানো নয় বরং এর পাশাপাশি হৃদরোগের ঝুঁকিসমুহের পরিবর্তন এবং সহযোগী রোগগুলোর চিকিৎসার মাধ্যমে টার্গেট অরগানগুলোকে রক্ষা করাই মূল লক্ষ্য।

নারী ও হৃদরোগ

একটি জীবনকে যদি পূর্ণাঙ্গ ও সুন্দরভাবে বাঁচাতে হয় তবে সবচেয়ে যে জিনিসটির বেশি প্রয়োজন সেটি হলো একটি সুস্থ হার্ট। সুস্থ হার্ট বয়স এবং লিঙ্গ নির্বিশেষে সবার জন্যই প্রয়োজন । পৃথিবীর প্রায় ৬০ শতাংশ মহিলার স্তনের ক্যান্সারকেই প্রধান স্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে মনে করেন। প্রকৃতপক্ষে এই স্তনের ক্যান্সারের প্রায় ৮ গুণেরও বেশি নারীর মৃত্যু হয় হৃদরোগ এবং স্ট্রোক-এর কারণে। প্রতিবছর পৃথিবীতে ৮.৬ মিলিয়ন নারীর মৃত্যু হয় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে। এটাই নারী মৃত্যুর সবচেয়ে বড় এবং একক কারণ।

সারা পৃথিবীতে যত নারীর মৃত্যু হয় তার এক তৃতীয়াংশের মৃত্যু হয় হৃদরোগে। আর উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এই চিত্র আরও আশংকাজনক। অর্থাৎ সকল নারী মৃত্যুর অর্ধেকই মারা যায় হৃদরোগ এবং স্ট্রোক-এর কারণে। যদিও মহিলারা হৃদরোগে আক্রান্ত হন পুরুষের চেয়ে প্রায় ১০ বছর পরে। কেননা ঋতুস্রাব স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়ার পূর্বে ইস্ট্রোজেন নামক হরমোনের প্রতিরোধী ক্ষমতার কারণে ঋতুবতী মহিলাদের হৃদরোগের সম্ভাবনা কম থাকে।

সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রেও নারীরা অবহেলিত। বিশেষ করে আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতেতো বটেই। আমাদের দেশে এ যাবত নারীর স্বাস্থ্য সেবায় যতটুকু নজর দেয়া হয়েছে তার প্রায় পুরোটাই প্রজনন স্বাস্থ্যের প্রতি। অর্থাৎ গর্ভকালীন বা প্রসবকালীন মৃত্যু রোধে কিছু কাজ হয়েছে।

সুতরাং এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে হৃদরোগাক্রান্ত নারীরা তুলনামূলকভাবে কম চিকিৎসা পেয়ে থাকেন। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, খুব কম সংখ্যক হৃদরোগাক্রান্ত নারীই অ্যানজিওপ্লাস্টি বা করোনারি আর্টারি বাইপাস অপারেশন হয়। সম্প্রতি এক সমীক্ষায় দেখা গেছে প্রতি দশ জনের মধ্যে ছয় জন চিকিৎসকই মনে করেন পুরুষরাই স্ট্রোকে মারা যায় বেশি, যদিও স্ট্রোকে নারীর মৃত্যু হয় প্রায় ১১%। পুরুষের ক্ষেত্রে তা মাত্র ৮.৫% ।

সম্প্রতি ওয়ার্ল্ড হার্ট ফেডারেশনের শুভেচ্ছা দূত, বিখ্যাত অভিনেত্রী জন হসইপুর এ প্রসঙ্গে খুব সুন্দরভাবে বলেছেন–'Women are the heart of their families

but are neglecting their own hearts. The good news is that small changes in life styles can bring big rewards and help us all to live life to its fullest.' অর্থাৎ নারী হচ্ছে আমাদের পরিবারের প্রাণ, কিন্তু তারাই তাদের নিজেদের হার্টকে অবহেলা করছেন। তবে এক্ষেত্রে সুখের বিষয় হচ্ছে তাদের জীবন যাত্রায় সামান্য পরিবর্তনই কিন্তু নিয়ে আসতে পারে বিরাট পুরস্কার এবং যা আমাদের সবার জীবনকে পরিপূর্ণভাবে বাঁচতে সাহায্য করবে।

সুতরাং এখনই প্রতিটি নারীকে তার নিজের স্বাস্থ্য সমস্যা সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। একটি সুস্থ জীবনের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ - তার হার্টকে কিভাবে সুস্থ রাখা যায় সে বিষয়ে সচেতন হতে হবে।

হৃদরোগ মুক্ত থাকতে নারীদের করণীয়

- **নিজে তামাক এবং ধূমপান থেকে বিরত থাকুন এবং আপনার চারপাশ তামাক ও ধূমপান মুক্ত রাখুন** - তামাক এবং ধূমপান হার্ট-অ্যাটাকের সম্ভাবনা সাধারণভাবে দ্বিগুণ করে আর অতিরিক্ত ধূমপায়ী নারীদের বেলায় তা বেড়ে যায় ৪ গুণ। ধূমপান করে না, কিন্তু ধূমপায়ীদের আশে-পাশে অবস্থান কারীদের হৃদরোগের ঝুঁকি বেড়ে যায় শতকরা ৩০ ভাগ।
- **ধূমপান এবং জন্ম নিয়ন্ত্রণের বড়ি এক সাথে গ্রহণ করলে হৃদরোগ এবং স্ট্রোকের সম্ভাবনা বেড়ে যায়**–এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, দৈনিক ১৫টি সিগারেট এবং তার সাথে জন্ম নিয়ন্ত্রণের বড়ি খেলে হৃদরোগের সম্ভাবনা বেড়ে ৩-৫ গুণ আর দৈনিক ১৫টির বেশি সিগারেট খেলে এই ঝুঁকি বেড়ে যায় ২০ গুণ। WHO -এর সমীক্ষায় বলা হয়েছে- ধূমপান ছেড়ে দেয়ার ১ বছরের মধ্যে হৃদরোগের ঝুঁকি কমে ৫০ শতাংশ আর ১৫ বৎসর পর এই ঝুঁকি কমে হয় অধূমপায়ীদের মতো। ঠিক একই রকম স্ট্রোকের ক্ষেত্রেও ধূমপান ছেড়ে দেয়ার ৫ বছর পর ঝুঁকির পরিমাণ অধূমপায়ীদের তুলনায় বেশি নয়।
- **উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখুন**–উচ্চ রক্তচাপ সম্পন্ন নারীর হৃদরোগের সম্ভাবনা স্বাভাবিক রক্তচাপ সম্পন্ন নারীর চেয়ে ৩.৫ জন বেশি।
- **ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখুন**–ডায়াবেটিস (টাইপ-II)। হৃদরোগের অন্যতম ঝুঁকির বিষয় এবং নারীদের জন্য ঝুঁকির পরিমাণ আরও বেশি। ডায়াবেটিক নারীর হৃদরোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা ৮ গুণ বেশি। ডায়াবেটিক পুরুষদের ক্ষেত্রে যা মাত্র ৩ গুণ। সুতরাং ডায়াবেটিস যেমন নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে তারচেয়েও বেশি সতর্ক থাকতে হবে ডায়াবেটিস প্রতিরোধে।

- **ব্যায়ামকে নিন জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে :** প্রতিদিন ৩০ মিনিট শারীরিক ব্যায়াম, যেমন–হাঁটা, বাগান করা বা সাইকেল চালনা-ই যথেষ্ট। তবে ব্যায়াম শুরু করার আগে অবশ্যই আপনার চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
- **অতিরিক্ত শারীরিক ওজন নিয়ন্ত্রণে এনে সুন্দর মেদহীন স্বাস্থ্য গড়ে তুলুন :** অতিরিক্ত শারীরিক ওজন হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ এবং স্ট্রোকের কারণে মৃত্যুর ঝুঁকি বহুলাংশে বাড়িয়ে দেয়। বিভিন্ন দেশের জাতীয় সমীক্ষায় দেখা গেছে, নারীদের মেদবহুল অতিরিক্ত শারীরিক ওজনের প্রাদুর্ভাব নারীদের ক্ষেত্রেই তুলনামূলকভাবে বেশি। সুতরাং সমন্বিত খাদ্যাভ্যাসের মাধ্যমে ওজন নিয়ন্ত্রণ করে স্বাস্থ্য সুন্দর রাখতে হবে। খাদ্য তালিকায় বেশি করে ফল, শাকসব্জি ও আঁশযুক্ত খাবার খাবেন, ভাজা-পোড়া, ফাস্টফুড, প্রাণিজ চর্বি এবং কোলেস্টেরল, অতিরিক্ত লবণ এবং মাত্রাতিরিক্ত এলকোহল পরিত্যাগ করাটা শ্রেয়।
- নিয়মিত আপনার ডাক্তারের পরামর্শ নিবেন এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাবেন বছরে অন্তত একবার।

দৈনন্দিন জীবন-অভ্যাসের পরিবর্তনেই আমরা পেতে পারি সুস্থ হার্ট এবং সুস্থ নারী; যারা সমগ্র সমাজের হার্ট।

হৃদরোগ ও গর্ভবতী নারী

যদি দক্ষতার সাথে পরিচালনা করা যায় তবে অধিকাংশ নারী যাদের হৃদরোগ রয়েছে তারা সফলভাবে গর্ভকালীন সময় পার হয়ে বাচ্চা প্রসব করতে পারেন। অবশ্যই হৃদরোগ গর্ভাবস্থার জন্য অতিরিক্ত ঝুঁকিপূর্ণ এবং প্রসূতি মৃত্যুর একটি অন্যতম কারণ।

গর্ভকালীন সময়ে হৃদযন্ত্র ও রক্তনালীর পরিবর্তন

গর্ভকালীন ৫ম সপ্তাহ থেকে ৩৫তম সপ্তাহ পর্যন্ত সুষম ও নিয়মিতভাবে দেহে রক্তের আয়তন বৃদ্ধি পায় যা কিনা স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে শতকরা ৩০ থেকে ৫০ ভাগ বেশি। গর্ভকালীন শেষ পাঁচ সপ্তাহ থেকে প্রসবকালীন সময় পর্যন্ত রক্তের আয়তন ধীরে ধীরে কমতে থাকে। প্রসবের ৪ থেকে ৬ সপ্তাহের মধ্যে রক্তের আয়তন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। গর্ভকালীন ৩৪ সপ্তাহ সময়ে কার্ডিয়াক আউটপুট (CO) বেড়ে ৭ লিটার/মিনিট হয়। যা কিনা স্বাভাবিক অবস্থায় ৫ লিটার/মিনিট থাকে। এই কার্ডিয়াক আউটপুট গর্ভকালীন সর্বশেষ সময় পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে এবং তা আরও বেড়ে যায় প্রসবকালীন দ্বিতীয় ধাপে।

কার্ডিয়াক আউটপুট আরো একধাপ বেড়ে যায় প্রসবকালীন তৃতীয় ধাপে যখন জরায়ু প্রসারিত হয়, এরপর কার্ডিয়াক আউটপুট রক্তের আয়তনের সাথে একত্রে কমতে থাকে। সার্বিক রক্ত সংবহনতন্ত্রের সাথে সাথে পালমোনারি রক্ত সংবহনতন্ত্রেও অতিরিক্ত রক্তপ্রবাহ হয়। সাধারণ রক্ত সংবহনতন্ত্রের অতিরিক্ত রক্তপ্রবাহ ভাগ হয়ে যায় জরায়ু, স্তন, কিডনির মধ্যে এবং ত্বকের রক্তনালীগুলিও প্রসারিত হয়।

বিশ্রামে থাকাবস্থায় গর্ভবতী মায়ের হৃদস্পন্দনের গতি যদি বেড়ে যায় তবে সেটা অবশ্যই চিকিৎসকের নজরে আনতে হবে। কেননা এই সময় রক্তের আয়তন কমে গিয়ে করোনারি ধমনীতে রক্তের প্রবাহ কমে যেতে পারে। গর্ভকালীন দ্বিতীয় ধাপে ডায়াস্টোলিক ব্লাডপ্রেসার কমতে থাকবে। যা কিনা পরবর্তী সময়ে গর্ভকালীন শেষ ধাপে গিয়ে বেড়ে যায়। প্রসব পরবর্তী সময়ও একেবারে ঝুঁকি মুক্ত নয়। বিশেষ করে যতক্ষণ পর্যন্ত রক্ত সংবহন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে না আসে আর সেজন্য প্রয়োজন প্রসব পরবর্তী কমপক্ষে আরও একমাস।

ভালো চিকিৎসা নির্ভর করে একটি সমন্বিত টিম ওয়ার্কের উপর; যে টিমের সদস্য থাকবেন স্থানীয় চিকিৎসক, স্ত্রীরোগ ও ধাত্রীবিদ্যা বিশেষজ্ঞ, একজন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ, একজন এনেসথেসিওলোজিস্ট এবং ক্ষেত্রবিশেষে একজন শিশু বিশেষজ্ঞ। সাধারণত গর্ভবতী মায়েরা বিভিন্ন জায়গায় যেমন- একবার স্থানীয় চিকিৎসক, একবার স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ, একবার হৃদরোগ বিশেষজ্ঞের চেম্বার এরকম এক চেম্বার থেকে আরেক চেম্বারে ঘুরে তারা চিকিৎসা নিতে পছন্দ করেন না। কিন্তু প্রয়োজনে তাদেরকে এটা করতে পরামর্শ এবং উৎসাহিত করতে হবে।

গর্ভকালীন সময়ে হৃদরোগের শ্রেণিবিন্যাস

বাতজ্বরজনিত হৃদরোগ : উন্নয়নশীল দেশে গর্ভকালীন সময়ে যে সমস্ত হৃদরোগ হয় তারমধ্যে বাতজ্বরজনিত হৃদরোগ সবচেয়ে বেশি। যদিও উন্নত বিশ্বে তা সবচেয়ে কম। বাতজ্বরজনিত হৃদরোগের মধ্যে হার্টের ভাল্বের রোগ- মাইট্রাল স্টেনোসিস (MS) সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। তাছাড়া অন্যান্য ভাল্বের রোগও (MR, AR এবং AS) হয়ে থাকে।

জন্মগত হৃদরোগ বা জন্মগত ত্রুটিজনিত হৃদরোগ : পালমোনারি হাইপারটেনশান, সায়ানোটিক হার্ট ডিজিজ ইত্যাদি।

ব্যাকটেরিয়াল এন্ডোকার্ডাইটিস : রিউমাটিক ভাল্বুলার ডিজিজ বা বাতজ্বরজনিত হৃদরোগের জটিলতা থেকে ব্যাকটেরিয়াল এন্ডোকার্ডাইটিস হতে পারে। কখনো কখনো স্ট্রেপটোকক্কাল পিউরপেরাল ইনফেকশন থেকেও এই রোগ হতে পারে।

হার্ট ফেইলিওর : এটি একটি দুর্লভ জটিলতা যা অতি উচ্চ রক্তচাপ বা এক্লামসিয়ার ক্ষেত্রে ঘটতে পারে, কিন্তু গর্ভকালীন সময়ে ক্রনিক এসেন্সিয়াল হাইপারটেনশনের ক্ষেত্রে তা ঘটে না বললেই চলে।

গর্ভকালীন কার্ডিওমায়োপ্যাথি : এই ক্ষেত্রে কনজেসটিভ হার্ট ফেইলিউর হয় কিন্তু এটিও গর্ভকালীন খুবই দুর্লভ রোগ।

কার্ডিয়াক অ্যারিদমিয়া : পূর্বে বিদ্যমান কোনো হৃদরোগ ছাড়া কার্ডিয়াক অ্যারিদমিয়া গর্ভকালীন সময় সাধারণত হয় না।

যে সকল রোগের কারণে গর্ভবতী মায়েরা বেশি ঝুঁকির সম্মুখীন

যে সকল রোগী গর্ভাবস্থায় হার্ট ফেইলিওর NYHA ক্লাস III বা IV এর পর্যায়ে পৌঁছেছে এবং যে কারণেই হোক না কেন তারাই সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির সম্মুখীন। এক্ষেত্রে নিম্নলিখিত রোগসমূহ উল্লেখযোগ্য :

১. **পালমোনারি উচ্চরক্তচাপ :** জন্মগতভাবে হার্টের পর্দায় ছিদ্রসহ Eisenmenger syndrome বা ছিদ্র ছাড়া পালমোনারি উচ্চরক্তচাপ গর্ভাবস্থায় মাতৃমৃত্যুর শতকরা ৩০ থেকে ৫০ ভাগ কারণ বহন করে।

২. **হার্টের ভাল্বের রোগ :** বিশেষ করে মাইট্রাল স্টেনোসিস (MS) এবং এওরটিক স্টেনোসিস (AS)।

৩. **অক্সিজেন স্বল্পতা সম্বলিত জন্মগত হৃদরোগ** (Congenital Cyanotic Heart Disease) : সামগ্রিকভাবে শতকরা ২ ভাগ মায়েদের মৃত্যু হয় সায়ানোটিক হার্ট ডিজিজের কারণে। এছাড়া শতকরা ৩০ ভাগ মায়েদের ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস, এরিদমিয়া, কনজাসটিভ হার্ট ফেইলিওর ইত্যাদি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৪. হাইপারট্রফিক কার্ডিওমায়োপ্যাথি (HCM)।

৫. যাদের জন্মগত ত্রুটিসম্পন্ন রক্তনালী আছে যেমন মারফান সিনড্রোম (Marfan syndrome) অথবা ধমনির কোয়ার্কটেশন (Coarctation বা of Aurfa)।

৬. যাদের হার্টের ভাল্ব পাল্টিয়ে নতুন ভাল্ব লাগানো হয়েছে এবং এন্টি কোয়াগুলেন্ট দিয়ে চিকিৎসা প্রয়োজন।

কম ঝুঁকিসম্পন্ন গর্ভবতী মায়েরা

- গর্ভধারণের পূর্বে যারা NYHA ক্লাস I বা II এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।
- যাদের হৃদপিণ্ডে ছিদ্র আছে এবং যে কারণে বাম থেকে ডান দিকে রক্তচলাচল করে।
- যাদের ভাল্বুলার রিগারজিটেশন আছে।
- যাদের অল্পমাত্রায় এওরটিক স্টেনোসিস এবং পালমোনারি স্টেনোসিস আছে।

গর্ভবতী মায়েদের যে সকল হৃদরোগের কারণে গর্ভস্থ শিশুর ঝুঁকি বেড়ে যায়

জন্মগত হৃদরোগ সম্পন্ন প্রত্যেক নারীরই তাদের গর্ভস্থ শিশুদের ঝুঁকি নিরূপণ করা প্রয়োজন। কেননা এই সমস্ত শিশুদের শতকরা ২ থেকে ১৬ ভাগেরই জন্মগত হৃদরোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তবে এইখানে উল্লেখযোগ্য যে, যে সমস্ত পিতার জন্মগত হৃদরোগে ভুগছেন, তাদের সন্তানদের জন্মগত হৃদরোগ হওয়ার সম্ভাবনা কম।

১. যে সকল গর্ভবতী মায়ের হার্ট ফেইলিওর NYHA ক্লাস III বা IV এর পর্যায়ে আছে।

২. যারা নিয়মিত অ্যান্টি কোয়াগুলেন্ট ট্যাবলেট Wareferin ৫ মি.গ্রা. এর উপরে সেবন করে।

৩. প্রি-এক্লামসিয়া এবং এক্লামসিয়া।

৪. যারা জন্মগতভাবে অতিরিক্ত অক্সিজেন স্বল্পতাজনিত হৃদরোগে ভুগছেন। তাদের শিশুরা বেশি ঝুঁকির সম্মুখীন। যেমন–শতকরা ৫০ ভাগ গর্ভস্থ শিশু স্বতঃস্ফূর্ত গর্ভপাত হয়ে থাকে, শতকরা ৩০ থেকে ৫০ ভাগের অকাল প্রসব এবং বয়সের তুলনায় কম ওজনের হয়ে থাকে।

গর্ভাবস্থায় মায়েদের হার্টে কি কি রোগ হতে পারে

১. উচ্চ রক্তচাপ প্রি-একামসিয়া এবং একামসিয়া।

২. প্রসবের পূর্ব এবং পরবর্তী সময় কার্ডিওমায়োপ্যাথি বা Peripartum cardiomyopathy (PPCM)।

৩. হার্ট অ্যাটাক–সাধারণত গর্ভাবস্থায় হার্ট অ্যাটাক কম হয়ে থাকে। কিন্তু যাদের পারিবারিকভাবে উচ্চমাত্রায় কোলেস্টেরল আছে, যারা স্থূলকায়, ধূমপান করেন, ডায়াবেটিস আছে এবং তুলনামূলকভাবে যারা বেশি বয়সে গর্ভধারণ করেন তাদের হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা থাকে। আবার এওরটিক বা করোনারি আর্টারী ডিসেকশনের কারণেও হার্ট অ্যাটাক হতে পারে। উল্লেখ্য, গর্ভাবস্থায় হার্ট অ্যাটাক হলে থ্রম্বোলাইটিক (স্ট্রেপ্টোকাইনেস) ইনজেকশন ব্যবহার করা উচিত নয়।

৪. এওরটিক ডিসেকশন

৫. পালমোনারি এম্বোলিজম

৬. দ্রুত হৃদস্পন্দনের ছন্দবৈষম্য

উচ্চ ঝুঁকিসম্পন্ন মায়েদের জন্য পরামর্শ

হার্টের ভাল্বের রোগ সম্পন্ন মায়েদের জন্য পরামর্শ

- হার্টের ভাল্বের রোগসম্পন্ন সকল মেয়েদেরই উপসর্গ থাকুক বা নাই থাকুক, ইকোকার্ডিওগ্রাফি টেস্টের মাধ্যমে হার্টের অবস্থা দেখে নেয়া দরকার।
- হার্টের ভাল্বের রোগের চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে গর্ভধারণের পূর্বেই চিকিৎসক এবং রোগীর সাথে আলোচনা হওয়া দরকার।

- গর্ভাবস্থার দ্বিতীয় ধাপ থেকেই চিকিৎসকের নিবিড় তত্ত্বাবধানে থাকা উচিত।
- ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা ফলপ্রসূ না হলে গর্ভাবস্থায়ও ভাল্বের অপারেশান করা যেতে পারে।
- তবে মায়ের জীবন কেবল হুমকির সম্মুখীন হলেই ওপেন হার্ট সার্জারির সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে।
- গর্ভবতী নারী যাদের কৃত্রিম ভাল্ব সংযোজন করা হয়েছে তাদের এন্টিকোয়াগুলেন্ট গ্রহণের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে।
- সর্বোপরি অবশ্যই ধাত্রীবিদ্যা বিশেষজ্ঞ এবং এনেস্থেসিওলজিস্ট সঙ্গে আলোচনা করেই ডেলিভারি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

কার্ডিওমায়োপ্যাথি মায়েদের জন্য পরামর্শ

ডাইলেটেড কার্ডিওমায়োপ্যাথি (DCM)

- যাদের পূর্ব থেকেই ডাইলেটেড কার্ডিওমায়োপ্যাথি (DCM) আছে। কিংবা যাদের DCM অথবা PPCM -এর পারিবারিক ইতিহাস আছে তাদের গর্ভধারণের পূর্বেই ইকোকার্ডিওগ্রাফি করতে হবে।
- এই সমস্ত রোগীদের যাদের হার্টের কার্যক্ষমতা কম (Ejection fraction<50) তাদেরকে গর্ভধারণে নিরুৎসাহিত করতে হবে।
- যাদের ডাইলেটেড কাডিংওমায়োপ্যাথির পারিবারিক ইতিহাস আছে তাদের পরবর্তীতে প্রসবের পূর্ব এবং পরবর্তী সময় কার্ডিওমায়োপ্যাথি বা Peripartum cardiomyopathy (PPCM) হওয়ার সম্ভাবনা বিবেচনায় রাখতে হবে।
- ডাইলেটেড কার্ডিওমায়োপ্যাথি (DCM) সম্পন্ন গর্ভবতী নারীরা উচ্চমাত্রায় ঝুঁকির সম্মুখীন। সুতরাং বিন্দুমাত্র অবস্থার অবনতি হলেই সাথে সাথে হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে।

হাইপারট্রফিক কার্ডিওমায়োপ্যাথি (HCM)

- উপসর্গহীন কার্ডিওমায়োপ্যাথির রোগীদের ক্ষেত্রে তেমন কোনো সমস্যা হয় না। তবে চিকিৎসার প্রয়োজন হয় শুধুমাত্র উপসর্গ দেখা দিলে।
- তবে যাদের হার্টের ডায়াস্টোলিক কর্মক্ষমতা কম তাদের হাসপাতালে ভর্তি রেখে বিশ্রাম এবং ওষুধের সাহায্যে চিকিৎসা করা যেতে পারে।

ইনফেক্টিভ বা ব্যাকটেরিয়াল এন্ডোকার্ডাইটিস

- প্রয়োজনে অপারেশানের সিদ্ধান্ত যত দ্রুত সম্ভব নিতে। কেননা গর্ভস্থ শিশুর ঝুঁকি নির্ভর করে মায়ের অবস্থার উপর।
- যাদের কৃত্রিম ভাল্ব সংযোজন করা হয়েছে এবং যাদের এন্ডোকার্ডাইটিসের পূর্ব ইতিহাস আছে তাদের স্বাভাবিক ডেলিভারির সময়েও প্রতিরোধমূলক এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করতে হবে।

চিকিৎসা

বেশিরভাগ রোগীদের ক্ষেত্রেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রসব করানোর চেষ্টা করা হয়ে থাকে। তবে উচ্চ ঝুঁকিসম্পন্ন মায়েদের ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী পূর্বনির্ধারিত সময়ে অপারেশনের মাধ্যমে প্রসব করানো উচিত।

মেটাবলিক সিনড্রোম ও হৃদরোগ

হৃদরোগের ঝুঁকিসমূহ পর্যালোচনা করে ১৯৮৮ সালে জি.এম রিভেন প্রথম সবার নজরে আনেন যে, সাধারণত রিস্ক ফ্যাক্টরগুলো (যেমন- ডিসলিপিডেমিয়া, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস ইত্যাদি) একসাথে জোটবদ্ধভাবে থাকে। তিনি এই রিস্ক ফ্যাক্টরগুলোর জোটবদ্ধতাকে সিনড্রোম-এক্স হিসাবে নামকরণ করেন এবং এগুলোকে হৃদরোগের ঝুঁকির কারণ হিসাবে চিহ্নিত করেন। দেখা যায় যারা হৃদরোগে ভুগছেন তাদের অনেকেরই রয়েছে বেশ কতগুলো রিস্ক ফ্যাক্টর। এই রিস্ক ফ্যাক্টরের মধ্যে অনেকগুলোকে আবার এক সাথে দেখতে পাওয়া যায়। সময়ের বিবর্তনে এবং হৃদরোগের কার্যকারণ সম্পর্কে আরও ভালো ধারণা পেতে, এর ফলাফল এবং চিকিৎসা পদ্ধতির আরও উন্নতি ঘটাতে মেটাবলিক রিস্ক ফ্যাক্টরগুলোর তালিকা যেমন বড় হয়েছে তেমনি এর নামও বদলে হয়েছে মেটাবলিক সিনড্রোম (যাকে সিনড্রোম-এক্স কিংবা ইনসুলিন রেজিস্টেন্স সিনড্রোমও বলা হয়)। সুতরাং মেটাবলিক সিনড্রোম হলো হৃদরোগের অনেকগুলো রিস্ক ফ্যাক্টরের সমন্বয়।

দুটো আলাদা সংস্থা-বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এবং জাতীয় কোলেস্টেরল শিক্ষা কার্যক্রম National Cholesterol Education Program's Adult Treatment Panel-III (NCEP ATP-III) স্বাধীনভাবে মেটাবলিক সিনড্রোমের সংজ্ঞা দিয়েছে। তবে অনেকের মতে NCEP ATP-III-এর দেয়া সংজ্ঞা অনুসারে রোগ নির্ণয় তুলনামূলকভাবে সহজ এবং কম ব্যয়সাপেক্ষ। তবে উভয় সংস্থাই এ ব্যাপারে একমত যে মেটাবলিক সিনড্রোমের প্রাথমিক ফসলই হলো হৃদরোগ।

মেটাবলিক সিনড্রোমের মোট ছয়টি অংশীদারকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করেছে ATP-III যেমন−এবডোমিনাল ওবেসিটি বা পেটমোটা, ডিসলিপিডেমিয়া বা রক্তে কোলেস্টেরলের ভারসাম্যহীনতা, উচ্চ রক্তচাপ, ইনসুলিন রেজিস্টেন্স বা গ্লুকোজ অসহিষ্ণুতা, প্রোইনফ্লামেটরি অবস্থা এবং প্রোথ্রম্বোটিক অবস্থা। আলাদা আলাদাভাবে এরা সবাই আবার কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ বা হৃদরোগেরও চিহ্নিত রিস্ক ফ্যাক্টর। সুতরাং এগুলোর সমন্বিত অবস্থান অবশ্যই হৃদরোগের ঝুঁকিকে বহুলাংশে বাড়িয়ে দেয়।

মেটাবলিক সিনড্রোম রোগনির্ণয় এবং এর প্রতিরোধের সুবিধার্থে ATP-III নিম্নলিখিত পাঁচটি অবস্থার মধ্যে যেকোনো তিনটির উপস্থিতিকেই যথেষ্ট বলে রায় দিয়েছে।

১. কোমরের মাপ : পুরুষ-৪০ ইঞ্চি বা ১০২ সে.মি.-এর বেশি হলে
মহিলা-৩৫ ইঞ্চি বা ৮৮ সে.মি. -এর বেশি হলে

২. প্রতি ১০০ মিলি রক্তে ট্রাইগ্লিসারিডের পরিমাণ :
১৫০ মিলিগ্রাম বা এর বেশি হলে

৩. প্রতি ১০০ মিলি রক্তে অধিক ঘন কোলেস্টেরলের পরিমাণ :
পুরুষের ক্ষেত্রে-৪০ মিলিগ্রাম-এর কম এবং
মহিলাদের ক্ষেত্রে-৫০ মিলিগ্রাম-এর কম হলে

৪. রক্তচাপ :
১৩০/৮৫ মিমি পারদ বা এর বেশি হলে

৫. অভুক্ত অবস্থায় প্রতি ১০০ মিলি রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ :
১০০ মিলিগ্রাম বা এর বেশি হলে

* অতিরিক্ত ওজন এবং স্থূলতা, ইনসুলিন রেজিস্টেন্স ও মেটাবলিক সিনড্রোমের সাথে সরাসরি জড়িত। তারপরও উচ্চমাত্রার বিএমআই-এর চেয়ে এবডোমিনাল ওবেসিটি বা পেটমোটা হৃদরোগের মেটাবলিক রিস্ক ফ্যাক্টরের সাথে বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং এক্ষেত্রে মেটাবলিক সিনড্রোমের অন্যতম উপাদান স্থূলতা তথা শারীরিক ওজন পরিমাপের জন্য সহজ পদ্ধতির কোমরের মাপ নেয়ার সুপারিশই করা হয়েছে।

* সাম্প্রতিককালে আমেরিকান ডায়াবেটিক এসোসিয়েশন অভুক্ত অবস্থায় প্রতি ১০০ মিলি রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ পুনর্নির্ধারণ করে < ১০০ মিলিগ্রাম করেছে, এর বেশি হলে তাদের হয় ডায়াবেটিসের পূর্বাবস্থা অথবা ডায়াবেটিস আছে বলে ধরে নিতে হবে। অভুক্ত অবস্থায় প্রতি ১০০ মিলি রক্তে গ্লুকোজের এই নতুন মাত্রাকেই মেটাবলিক সিনড্রোমের জন্য প্রযোজ্য বলে ধরা হয়েছে।

- মেটাবলিক সিনড্রোম তাদেরই হয় যারা সাধারণত শারীরিক পরিশ্রম কম করে।
- শতকরা ৮৪ জন মেটাবলিক সিনড্রোমের রোগী মোটা। আমেরিকায় এক তৃতীয়াংশ মোটা মানুষই মেটাবলিক সিনড্রোমে ভুগছেন।

- টাইপ-২ ডায়াবেটিস রোগী যাদের রয়েছে মেটাবলিক সিনড্রোম তাদের হৃদরোগের ঝুঁকি অন্যদের তুলনায় বেশি।

- মেটাবলিক সিনড্রোম আক্রান্ত মহিলারা সাধারণত শারীরিকভাবে কম পরিশ্রমী। Framingham Heart Study-এর গবেষণায় দেখা গেছে যে, যাদের মেটাবলিক সিনড্রোম আছে তাদের মধ্যে শতকরা ২৫ জনের নতুন করে হৃদরোগের সম্ভাবনা রয়েছে। মেটাবলিক সিনড্রোম আছে এরকম পুরুষদের ক্ষেত্রে ১০ বৎসরের হৃদরোগের ঝুঁকি শতকরা ১০ থেকে ২০ ভাগ। ধারণা করা হচ্ছে নিকট ভবিষ্যতে ৬০ বছরের উর্ধ্বে শতকরা ৫০ ভাগ লোকই মেটাবলিক সিনড্রোমে আক্রান্ত হবে, যার ফলে হৃদরোগের ঝুঁকি যেমন বেড়ে যাবে তেমনি মানুষের সামাজিক এবং অর্থনীতির উপর পড়বে এর নেতিবাচক প্রভাব।

চিকিৎসা

মেটাবলিক সিনড্রোম যাদের আছে তাদের অবশ্যই Therapeutic Lifestyle Change (TLC) বা চিকিৎসার লক্ষ্যে জীবনধারার পরিবর্তন করতে হবে। এই পদ্ধতিই মেটাবলিক সিনড্রোম চিকিৎসার প্রধান উপায়। এর মাধ্যমে মেটাবলিক সিনড্রোমের প্রত্যেকটি রিস্ক ফ্যাক্টরকে কমিয়ে আনা বা পুরোপুরি নির্মূল করা সম্ভব এবং এর ফলে হৃদরোগ এবং ডায়াবেটিসের সম্ভাবনাও কমিয়ে আনা সম্ভব।

জীবনধারার পরিবর্তনের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত মূলত তিনটি বিষয়ের উপর আপনাকে গুরুত্ব দিতে হবে–

- শারীরিক ওজন কমিয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় আনতে হবে
- নিয়মিত ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রম করতে হবে
- সুষমখাদ্য গ্রহণ করতে হবে

এছাড়া আরো কিছু বিষয় গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা দরকার, যেমন- কারো মদ্যপানের অভ্যাস থাকলে তা বাদ দিতে হবে কেননা এলকোহল উচ্চ রক্তচাপ এবং রক্তে ট্রাইগ্লিসারিডের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। যারা ধূমপান করেন তাদের অবশ্যই তা বর্জন করতে হবে, কেননা ধূমপান রক্তে ট্রাইগ্লিসারিডের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয় এবং এইচডিএল-এর পরিমাণ কমায়।

জীবনধারার পরিবর্তনের পরও যদি কাঙ্ক্ষিত ফল না পাওয়া যায় তবে কোনো কোনো রিস্ক ফ্যাক্টর কমিয়ে আনতে বা নির্মূল করতে অবশ্যই ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করতে হবে যেমন–উচ্চ রক্তচাপ কমাতে, রক্তে ট্রাইগ্লিসারিডের পরিমাণ কমাতে এবং এইচডিএল-এর পরিমাণ বাড়াতে ওষুধ দিয়ে চিকিৎসার প্রয়োজন হতে পারে। এছাড়া যাতে রক্ত জমাট বেঁধে না যায় সেজন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিয়মিত অ্যাসপিরিন সেবন করা যেতে পারে।

মেটাবলিক সিনড্রোমের এই ক্রমবর্ধমান পরিস্থিতি এখন আর শুধু মেডিকেল সমস্যা নয়। এর প্রকোপ ঠেকাতে হলে জনগণের মানসিকতার পরিবর্তন, সামাজিক সংস্কার এবং সুনির্দিষ্ট রাষ্ট্রীয় নীতিমালা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

কোলেস্টেরল ও হৃদরোগ

কোলেস্টেরল কী

কোলেস্টেরল আসলে ফ্যাট জাতীয় এক প্রকার পদার্থ। রাসায়নিক গঠন অনুসারে জটিল মনোহাইড্রিক সেকেন্ডারি অ্যালকোহল এবং স্টেরল পরিবারের এক গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। কোলেস্টেরল একটি নরম, সাদা মোমের ন্যায় বস্তু যা রক্তস্রোতে পাওয়া যায়। ফ্যাটি অ্যাসিডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এ কোলেস্টেরলই মোম তৈরি করে। কোলেস্টেরল পানিতে গলে না অথচ ক্লোরোফর্ম, ইথার, অ্যালকোহলসহ যে কোনও ফ্যাট দ্রাবকেই গলে যায়। চর্বি বা তেলের সঙ্গে যুক্ত হলে প্রচুর পরিমাণে জল শুষে নিতে পারে। আমাদের সকলের দেহে কোলেস্টেরল আছে। আমাদের দেহই কোলেস্টেরল তৈরি করে। প্রতিদিন গড়ে এক থেকে দেড় গ্রাম কোলেস্টেরল আমাদের দেহে সংশ্লেষিত হয়। মাংস এবং গবাদি পশুজাত খাদ্যেও কোলেস্টেরল থাকে। উদ্ভিদজাত খাদ্যে কোলেস্টেরল থাকে না। আমরা খাদ্য থেকে দৈনিক কমবেশি মাত্র ৩০০ মিলিগ্রাম কোলেস্টেরল পেয়ে থাকি।

কোলেস্টেরলের প্রকারভেদ

রক্তে কোলেস্টেরল প্রবাহিত হয় লাইপোপ্রোটিন যৌগরূপে। এই লাইপোপ্রোটিন হচ্ছে এক ধরনের প্রোটিনযুক্ত কোলেস্টেরল। যাতে বিভিন্ন ঘনত্বের প্রোটিন থাকে, যেমন–অধিক ঘন লাইপোপ্রোটিন বা HDL (ভালো কোলেস্টেরল), কম ঘন লাইপোপ্রোটিন বা LDL (খারাপ কোলেস্টেরল), মাঝারী কম ঘন লাইপোপ্রোটিন বা ILDL, খুব কম ঘন লাইপোপ্রোটিন বা VLDL এবং কাইলোমাইক্রন (Chylomicron)। তবে সব ধরনের কোলেস্টেরলই হৃদরোগের ঝুঁকির সাথে সম্পর্কিত। রক্তে কোলেস্টেরল নির্ণয় করার জন্য চিকিৎসকরা নিম্নবর্ণিত কোলেস্টেরলগুলোই টেস্ট করাতে রোগীকে পরামর্শ দেন। প্রাথমিকভাবে শুধু টোটাল কোলেস্টেরল (Total Cholesterol) পরীক্ষা করানো যেতে পারে। তবে যাদের হৃদরোগ আছে বা যারা হৃদরোগের ঝুঁকির মধ্যে আছে তাদের নিচের সবগুলো টেস্টই করাতে হয়, যাকে একত্রে লিপিড প্রোফাইল বলে। লিপিড প্রোফাইল রোগীর খালি পেটে বা অভুক্ত অবস্থায় করা উচিত। কোলেস্টরল পরীক্ষা ৯-১২ ঘন্টা কোনো কিছু না খেয়ে করতে হয়। তাই সকালে নাস্তার আগে কোলেস্টেরল পরীক্ষার জন্য রক্ত দেয়াই উত্তম।

বিভিন্ন পর্যায়ক্রমিক রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা

টোটাল কোলেস্টেরল

২০০ মিগ্রা/ডিএল-এর কম	প্রত্যাশিত
২০০-২৩৯ মিগ্রা/ডিএল	বর্ডারলাইন হাই
২৪০ মিগ্রা/ডিএল বা এর চেয়ে বেশি	উচ্চ

এল ডি এল কোলেস্টেরল

১০০ মিগ্রা/ডিএল-এর কম	আদর্শ মাত্রা
১০০-১২৯ মিগ্রা/ডিএল	স্বাভাবিক
১৩০-১৫৯ মিগ্রা/ডিএল	বর্ডারলাইন হাই
১৬০-১৮৯ মিগ্রা/ডিএল	উচ্চ
১৯০ মিগ্রা/ডিএল এবং এর চেয়ে বেশি	অতি উচ্চ

এইচ ডি এল কোলেস্টেরল

৪০ মিগ্রা/ডিএল-এর কম	হৃদরোগের প্রধান ঝুঁকি ফ্যাক্টর
৬০ মিগ্রা/ডিএল	হৃদরোগের বিরুদ্ধে কিছু সুরক্ষা সরবরাহ করবে

- **টোটাল কোলেস্টেরল বা টিসি**-এরা উচ্চমাত্রায় রক্তে থাকলে হৃদরোগের ঝুঁকি থাকে। বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাণ কমানোর সাথে সাথে হৃদরোগজনিত মৃত্যুর ঝুঁকি বহুলাংশে কমে যায়।
- **লো-ডেনসিটি লাইপোপ্রোটিন বা এলডিএল (খারাপ কোলেস্টেরল)**–যা থাকে ৭৫ থেকে ৮০ শতাংশ জুড়ে। এরাই চর্বিকে ধমনীর দেয়ালে জমা করে রক্ত চলাচলে বাধার সৃষ্টি করে যা কিনা পরবর্তীতে হার্ট অ্যাটাক (MI) এবং স্ট্রোক (Stroke)-এর ঝুঁকি বাড়ায়।
- **হাই-ডেনসিটি লাইপোপ্রোটিন বা এইচডিএল (ভালো কোলেস্টেরল)**–যা থাকে ২০ থেকে ২৫ শতাংশ জুড়ে। এরা ধমনী থেকে চর্বিকে বহন করে নিয়ে যায় লিভারে এবং পর্যায়ক্রমে দেহ থেকে চর্বি নিষ্কাশনে সাহায্য করে। এইচডিএল কোলেস্টেরল রক্ত চলাচল স্বাভাবিক রাখতে সাহায্য করে। এইচডিএল দেহের জন্য উপকারী।

- ট্রাইগ্লিসারাইড বা টিজি-ট্রাইগ্লিসারাইড এক ধরনের ফ্যাট যা লিভারে উৎপাদিত হয়, যা কিছু কিছু খাবারেও থাকে। সাধারণত রক্তে সামান্যই ট্রাইগ্লিসারাইড থাকে। বরং চর্বিকোষে ট্রাইগ্লিসারাইড বেশি মাত্রায় জমা থাকে। খাবারে বেশি শর্করা জাতীয় খাদ্য থাকলে, অতিরিক্ত ওজন, আয়েশী জীবন, ধূমপান এবং মদ্যপান শরীরে ট্রাইগ্লিসারাইড বাড়িয়ে দেয়। ট্রাইগ্লিসারাইড ১৫০-৪৯৯ মিগ্রা/ডিএল থাকলে হার্ট অ্যাটাকের আশঙ্কা বেড়ে যায়। ট্রাইগ্লিসারাইডের লেভেল ৫০০ মিগ্রা/ডিএল এর উপরে গেলে ওষুধ দিয়ে চিকিৎসার প্রয়োজন আছে কারণ এই অবস্থায় প্যানক্রিয়াস বা অগ্ন্যাশয়ে প্রদাহ হতে পারে।

একদিকে যেমন দেহের কার্যক্ষমতা ঠিক রাখার জন্য এইচডিএল ও এলডিএল উভয় প্রকার কোলেস্টেরল এর সঠিক মাত্রা দেহে বিদ্যমান থাকা প্রয়োজন তেমনি অন্যদিকে এদের মাত্রাস্বল্পতা বা মাত্রাতিরিক্ততা দেহের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। বাড়াতে পারে কার্ডিওভাসকুলার ডিজিজ (CVD) এবং স্ট্রোকের ঝুঁকি। তাই, রক্তে কোলেস্টেরলের সঠিক মাত্রা বজায় রাখতে চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া উচিত এবং নিয়মিত রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা পরীক্ষা করানো উচিত। প্রায়ই রক্তে এই দুটো কোলেস্টেরলের যুদ্ধ চলে। এদের হার ও জয়ের উপর নির্ভর করে আমাদের ভালো-মন্দ থাকা। যে কারণে খাদ্য তালিকায় চর্বি ও তেল জাতীয় খাবারের নির্বাচনের সময় খেয়াল রাখতে হয় তাদের এইচডিএল ও এলডিএল বাড়াবার বা কমাবার ক্ষমতা কতটুকু।

গবেষণায় দেখা গেছে, মাছের তেলের লিনোলেনিক অ্যাসিড, ইকোসাপেন্টায়নিক অ্যাসিড, ডেকোসাহেক্সাজনিক অ্যাসিড রক্তে কোলেস্টেরলের এইচডিএল এর মাত্রা বাড়িয়ে দেয়, কমায় এলডিএল ও ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা।

লেসিথিন নামক মোমজাতীয় এক ধরনের ফসফোলিপিড লিভারে তৈরি হয়, যা কোলেস্টেরলের এইচডিএল অল্প পরিমাণে বাড়াতে সাহায্য করে। এই লেসিথিন তৈরিতে সাহায্য করে আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড, কোলিন ও ইসিটল। এগুলো পাওয়া যায় দানাশস্য, দুধ, ফল, মাংসে। কোলিন বিশেষ করে পাওয়া যায় গম, ব্রেন, লিভার ও কিডনিতে।

নিয়মিত ব্যায়াম করলেও এইচডিএল-এর পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এছাড়া জানা গেছে যারা নিয়মিত ধূমপান করেন, তারা যদি ধূমপান ছেড়ে দেন তা হলেও এইচডিএল এর মাত্রা বাড়তে পারে।

কোলেস্টেরলের প্রয়োজনীয়তা

- দেহের নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজে কোলেস্টেরল অপরিহার্য।
- পুরুষ এবং নারীর সেক্স হরমোন (ইস্ট্রোজেন, প্রোজেস্টেরন, এস্ট্রাডিয়ল ইত্যাদি) উৎপাদন ।
- ফ্যাট জাতীয় খাদ্য পরিপাকের জন্য গ্লাইকোকোলেট পিত্ত লবণ তৈরি।
- ত্বকে ভিটামিন ডি সংশ্লেষণ।
- আমাদের কিডনির ওপরে অবস্থিত অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি থেকে গ্লুকোকর্টিকয়েড (কার্বহাইড্রেট বিপাকের জন্য যা প্রয়োজন), মিনারেলোকর্টিকয়েড (দেহে খনিজ লবণের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে) এবং সেক্স স্টেরয়েড হরমোনের নিঃসরণ-এইসব কিছুর নেপথ্যেই রয়েছে কোলেস্টেরলের অবদান।
- কোলেস্টেরলের অভাবে মানুষ তার প্রজনন ক্ষমতা হারাতে পারে। লিভার হারাবে তার হজম করানোর ক্ষমতা। দেহের সমস্ত বিপাকীয় ব্যবস্থা পড়বে ভেঙ্গে। ভিটামিন ডি তৈরিতে পড়বে ঘাটতি। হাড় হবে ভঙ্গুর। দেখা দেবে রিকেট, অস্টিওম্যালেসিয়া। দুর্বল হবে দাঁত। এক কথায় সুস্থভাবে বেঁচে থাকাটাই দুঃসাধ্য হয়ে যেতে পারে।

১. প্রাণিজ ফ্যাট-ঘি, মাখন, মাছের তেল ইত্যাদি। এগুলোতে প্রয়োজনীয় ফ্যাটি এসিড কম থাকে। তবে এগুলোতে পর্যাপ্ত ভিটামিন এ ডি ও ক্যালসিয়াম থাকে।

২. উদ্ভিজ ফ্যাট-সরিষা, বাদাম, জলপাই, তিল, সূর্যমুখী তেল, নারকেল তেল ইত্যাদি সব ভোজ্য তেলই উদ্ভিজ। এই ফ্যাট শরীরের প্রয়োজনীয় ফ্যাটি এসিডের জন্য গুণগত মানের বিচারে প্রাণিজ ফ্যাট থেকে উন্নততর।

চর্বিরও পুষ্টিকারক ভূমিকা আছে। চর্বি শরীরে শক্তির যোগান দেয় এবং অন্য পুষ্টির কাজে সহায়তা করে। কিন্তু শরীরে চর্বির প্রয়োজন সামান্য এবং অতিরিক্ত সম্পৃক্ত চর্বি রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। কয়েক ধরনের চর্বি আছে এবং কোলেস্টেরল ও হৃদরোগের ঝুঁকির বিষয়ে তাদের আলাদা আলাদা প্রভাব আছে।

সম্পৃক্ত চর্বি

তেল এবং চর্বির অন্যতম উপাদান হলো ফ্যাটি এসিড। এই ফ্যাটি এসিড আসলে শৃংখলাবদ্ধ কতগুলো কার্বনের অণু দিয়ে তৈরি। যেসব ফ্যাটি এসিডের কার্বন

চেইন একটি বন্ড দ্বারা যুক্ত তাদের বলে সম্পৃক্ত বা স্যাচুরেটেড ফ্যাটি এসিড। এই চর্বিগুলো স্বাভাবিক তাপমাত্রায় এবং ফ্রিজে জমাট বেঁধে থাকে। প্রাণিজ চর্বি এই গোত্রের চামড়াসহ হাঁস বা মুরগি, গরু-খাসির চর্বি, পূর্ণ ননীযুক্ত দুধ, ডালডা, মাখন, ঘি, পাম ওয়েল। যারা বেশি সম্পৃক্ত চর্বি খান তাদের এল ডি এল কোলেস্টেরল বেশি থাকে। সম্পৃক্ত চর্বি খাওয়া বাদ দিলে এল ডি এল কোলেস্টেরল কমে যায়।

অসম্পৃক্ত চর্বি

এই চর্বিগুলো ফ্রিজে রাখলেও জমে যায় না। এ ধরনের চর্বির মধ্যে রয়েছে উদ্ভিজ্জ তেল যেমন - সরিষা, সয়াবিন, সূর্যমুখী, জলপাই, তিল, বাদাম তেল, মাছের চর্বি ইত্যাদি। দুই ধরনের অসম্পৃক্ত চর্বি আছে। যেসব ফ্যাটি এসিডের একটি কার্বন চেইন আর একটির সঙ্গে দুটি বন্ড দ্বারা যুক্ত তাদের বলে মনো আনস্যাচুরেটেড (অসম্পৃক্ত) ফ্যাটি এসিড বা মনো অসম্পৃক্ত চর্বি। এই ডাবল বন্ড একাধিক হলে তাকে বলে পলি আনস্যাচুরেটেড (অসম্পৃক্ত) ফ্যাটি এসিড বা পলি অসম্পৃক্ত চর্বি। অসম্পৃক্ত চর্বি সেটা মনো হোক বা পলি হোক এটা কোলেস্টেরল কমায়। অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিডের মধ্যে আলফা লিনোলিক এসিড আমাদের দেহে করোনারি আর্টারির প্রসারণ ঘটায়, রক্ত জমাট বাঁধা রোধ করে। যে কারণে হার্ট অ্যাটাক প্রতিরোধে ভোজ্য তেলে এই ফ্যাটি এসিডটি থাকা প্রয়োজন। অন্যদিকে লিনোলিক এবং আরকিডোনিক এসিড, অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড হওয়া সত্ত্বেও, অতিরিক্ত থাকলে রক্তে কোলেস্টেরল বাড়ায়, করোনারি আর্টারির সংকোচন বাড়ায়, ফলে রক্ত জমাট বাঁধতে পারে। সুতরাং আমাদের ভোজ্য তেলে এই লিনোলিক এবং আলফা লিনোলিক এসিডের মধ্যে সমতা থাকা জরুরি। উদ্ভিজ্জ তেলে অসম্পৃক্ত চর্বি পাওয়া যায়। ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড এক ধরনের পলি অসম্পৃক্ত চর্বি। মাছে বিশেষ করে সামুদ্রিক মাছে ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড পাওয়া যায়। মাছের তেল হৃদরোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে। কারণ মাছের তেলের নানা ধরনের আনস্যাচুরেটেড (অসম্পৃক্ত) ফ্যাটি এসিড রক্তে কোলেস্টেরল, এল ডি এল ও ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা কমায় এবং এইচ ডি এল বাড়িয়ে দেয়।

এছাড়া রক্তে কোলেস্টেরল বেড়ে যাবার পেছনে আরো কতগুলো রিস্ক ফ্যাক্টর কাজ করে। এই রিস্কফ্যাক্টরগুলো দু'ধরনের হয়–নিয়ন্ত্রণযোগ্য ও অনিয়ন্ত্রণযোগ্য।

১. **নিয়ন্ত্রণযোগ্য রিস্ক ফ্যাক্টর**–উপরে বর্ণিত ফ্যাট জাতীয় খাবার ছাড়াও ডায়াবেটিস, হাইপোথাইরয়ডিজম, অতিরিক্ত ওজন এবং অপর্যাপ্ত শারীরিক শ্রম।

২. **অনিয়ন্ত্রণযোগ্য রিস্ক ফ্যাক্টর**–

- **বংশগত কারণ :** কতটুকু কোলেস্টেরল আপনার শরীরে উৎপাদিত হবে এবং কত দ্রুত তা শরীর থেকে নির্গত হবে সেটা আংশিকভাবে নির্ভর করে জীন বা বংশগতির উপর। যদিও বংশগতির কারণে কোলেস্টেরলের উচ্চমাত্রা পরিবারে প্রবাহিত হতে পারে তবুও খুব আক্রান্ত পরিবারের মানুষ উচ্চমাত্রার কোলেস্টেরলে আক্রান্ত হতে পারেন যদি না তারা পর্যাপ্ত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা না নেন। আবার পরিবারে উচ্চমাত্রার কোলেস্টেরলে ভোগার কোনো ইতিহাস না থাকলেও সেই পরিবারের কেউ কেউ উচ্চ কোলেস্টেরলে ভুগতে পারেন।

ইদানিংকালে অনেক বাংলাদেশী উচ্চ কোলেস্টেরলে ভুগছেন এমনকি পরিবারে উচ্চ কোলেস্টেরল থাকার ইতিহাস না থাকলেও, আবার অনেকে তুলনামূলকভাবে অনেক কম বয়সেই উচ্চ কোলেস্টেরলে আক্রান্ত হতে দেখা যাচ্ছে। বংশগত কারণে শরীরে দেখা দিতে পারে কোলেস্টেরলের ভারসাম্যহীনতা।

- **বয়স :** বয়স বাড়ার সাথে সাথে রক্তে কোলেস্টেরল বাড়তে পারে।

- সাধারণত ২০ বছর বয়সের পর থেকে মানবদেহে কোলেস্টেরল বাড়তে শুরু করে।
- ৫০ বছর বয়স পর্যন্ত পুরুষের দেহে কোলেস্টেরলের পরিমাণ মহিলাদের তুলনায় কম থাকে।
- অল্পবয়সে মেয়েদের শরীরে এইচডিএল বা ভালো কোলেস্টেরলের পরিমাণ ছেলেদের তুলনায় বেশি থাকে।

কোলেস্টেরলজনিত বিভিন্ন রোগ

রক্তে কোলেস্টেরল বেড়ে গেলে তার প্রভাব অবশ্যই শরীরে পড়বে তবে এর নির্দিষ্ট কোনো উপসর্গ নেই যা দিয়ে সহজে তা বোঝা যাবে। কোলেস্টেরল বর্তমানে প্রতিবছর প্রায় ৪০ লক্ষ মানুষের মৃত্যুর জন্য দায়ী।

রক্তে কোলেস্টেরলের ভারসাম্যহীনতার (Dysl ipidaemia– ডিসলিপিডেমিয়া) কারণে নিম্নলিখিত সমস্যাগুলো দেখা যেতে পারে–

- অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস
- করোনারি আর্টারি ডিজিজ
- স্ট্রোক

- পেরিফেরাল আর্টারিয়াল ডিজিজ
- মেটাবলিক সিনড্রম
- অগ্নাশয়ের প্রদাহ

সুতরাং এসব কঠিন ও মারাত্মক রোগ দেখা দেয়ার আগেই নিয়মিত রক্ত পরীক্ষা করে দেখতে হবে-কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে আছে কিনা। আর না থাকলে যত দ্রুত সম্ভব তা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করতে হবে।

রক্তে কোলেস্টেরলের কাঙ্ক্ষিত মাত্রা

সাধারণত একজন সুস্থ মানুষের রক্তে টোটাল কোলেস্টেরলের পরিমাণ হওয়া উচিত প্রতি ১০০ মিলি লিটারে ১৯০ মিলিগ্রাম বা প্রতি এক লিটারে ৫ মিলি মোল-এর নিচে এবং এলডিএল কোলেস্টেরলের পরিমাণ হওয়া উচিত প্রতি ১০০ মিলি লিটারে ১১৫ মিলিগ্রাম বা প্রতি এক লিটারে ৩ মিলি মোল-এর নিচে। তবে যাদের হৃদরোগ আছে এবং যাদের ডায়াবেটিস আছে তাদের রক্তে টোটাল কোলেস্টেরলের পরিমাণ প্রতি ১০০ মিলি লিটারে ১৭৫ মিলিগ্রাম বা প্রতি এক লিটারে ৪.৫ মিলি মোল-এর নিচে এবং এলডিএল কোলেস্টেরলের পরিমাণ হওয়া উচিত প্রতি ১০০ মিলি লিটারে ১০০ মিলিগ্রাম বা প্রতি এক লিটারে ২.৫ মিলি মোল-এর নিচে।

এইচডিএল কোলেস্টেরল পুরুষের বেলায় প্রতি ১০০ মিলি লিটারে ৪০ মিলিগ্রাম বা প্রতি এক লিটারে ১ মিলি মোল-এর নিচে এবং মহিলাদের বেলায় প্রতি ১০০ মিলি লিটারে ৪৬ মিলিগ্রাম বা প্রতি এক লিটারে ১.২ মিলি মোল - এর নিচে হলে এবং অভুক্ত অবস্থায় ট্রাইগ্লিসারাইড প্রতি ১০০ মিলি লিটারে ১৫০ মিলিগ্রাম বা প্রতি এক লিটারে ১.৭ মিলি মোল এর বেশি হলে সেটা অবশ্যই হৃদরোগের জন্য অতিরিক্ত ঝুঁকির কারণ।

রক্তে কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণের উপায়

মূলত দুই পদ্ধতিতে রক্তে কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব

১. জীবনধারার পরিবর্তনের মাধ্যমে
২. ওষুধের মাধ্যমে

জীবনধারার পরিবর্তনের মধ্যে রয়েছে– চর্বি জাতীয় খাবার পরিহার, ধূমপান বর্জন, অতিরিক্ত ওজন কমানো এবং নিয়মিত ব্যায়াম করা। শুধুমাত্র জীবনধারার পরিবর্তনের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া না গেলে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণের ওষুধ খেতে হবে।

তবে একজন সুস্থ মানুষের বেলায় রক্তে উচ্চমাত্রায় কোলেস্টেরলের জন্য ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করাতে হবে কিনা সে সিদ্ধান্ত নির্ভর করে ওই ব্যক্তির সামগ্রিক হৃদরোগের ঝুঁকির মাত্রার উপর। যেমন–যে সকল হৃদরোগীর ডায়াবেটিস আছে তাদের অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী একটি স্ট্যাটিন গ্রুপের ওষুধ খাওয়া শুরু করতে হবে। সেক্ষেত্রে রক্তে এলডিএল কোলেস্টেরলের এর পরিমাণ যাই থাকুক না কেন।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে মানুষের দেহে কোলেস্টেরলের ভারসাম্যহীনতা (ডিসলিপিডেমিয়া) হৃদরোগের অন্যতম প্রধান কারণ। সুতরাং এই কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণ করা গেলেই হৃদরোগ বহুলাংশে প্রতিরোধ করা সম্ভব।

বুকে ব্যথা হলে কি করবেন?

হার্ট বা হৃদপিণ্ড আমাদের শরীরের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই হৃৎপিণ্ডটি আসলে একটি পেশিবহুল পাম্প বিশেষ। এই পেশিগুলিতে যে সব ধমনী/রক্তনালী রক্ত সরবরাহ করে তাদের বলে করোনারি আর্টারি। এই করোনারি আর্টারি কোনও কারণে 'ব্লক' হলে হৃদপিণ্ডের পেশি নষ্ট হয়ে যায়। আর্টারি ব্লক হওয়ার জন্য হৃদপিণ্ডের পেশির কিছু অংশ নষ্ট হয়ে যাওয়াকেই 'হার্ট অ্যাটাক' বলা হয়। বিভিন্ন কারণে হৃদপিণ্ডের করোনারি আর্টারিতে চর্বি জমা হয়ে আর্টারিতে আংশিক প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। তার সঙ্গে রক্ত জমাট বাঁধলে কিংবা রক্তনালী সংকুচিত হলে, আর্টারির 'ব্লক' সম্পূর্ণ হয়ে যায়। এই 'ব্লক'-এর সময়কাল যদি ২০ থেকে ৩০ মিনিটের বেশি থাকে, তাহলেই হার্ট অ্যাটাক হয়ে যায়। ব্লক যদি ওই সময়ের মধ্যে খুলে যায়, তবে রোগী তখনকার মতো হার্ট অ্যাটাকের হাত থেকে বেঁচে যান।

কী কী কারণে হয়?

সারা পৃথিবীর বেশ কয়েকটি জায়গায় বিভিন্ন জনসমীক্ষায় দেখা গেছে যে, কতগুলি 'বিশেষ' কারণের জন্যই হার্ট অ্যাটাক হয়। এই কারণগুলিকে বলা হয় 'রিস্ক ফ্যাক্টর'। এই রিস্ক ফ্যাক্টরকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়।

ক. **গ্রুপ ওয়ান :** 'আনকন্ট্রোলেবল রিস্ক ফ্যাক্টরস' বা নিয়ন্ত্রণের অযোগ্য ঝুঁকি সমূহ। এই রিস্ক ফ্যাক্টরগুলোর ক্ষেত্রে মানুষের কোনও হাত নেই। চেষ্টা করেও একে নিয়ন্ত্রণে আনা যায় না। এগুলো যথাক্রমে :

১. **বংশগত :** যদি দেখা যায় পরিবারের কারও ৫০ বছর বয়সের নিচে হার্ট অ্যাটাকের ঘটনা ঘটেছে, সেক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তির পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা বেশি থাকে।

২. **বয়স :** বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে হার্ট অ্যাটাক হয় ৩৫ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে। তবে ইদানিংকালে ৩৫ বছরের নিচেও হার্ট অ্যাটাকের ঘটনা ঘটতে দেখা যায়।

৩. **পুরুষ :** পুরুষদের মধ্যেই হার্ট অ্যাটাকের আশঙ্কা থাকে। সমীক্ষায় দেখা গেছে, ৪০ থেকে ৬৫ বছরের পুরুষ ও নারীদের মধ্যে হার্ট অ্যাটাকের হার ৪:১। চল্লিশ বছরের নিচে এই হার ৮:১ এবং সত্তর বছরের উপরের হার ১:১। সম্প্রতি এক সমীক্ষায় দেখা গেছে প্রতি দশজনের মধ্যে ছয় জন চিকিৎসকই মনে করেন পুরুষরাই স্ট্রোকে মারা যায় বেশি, যদিও স্ট্রোকে নারীর মৃত্যু হয় প্রায় ১১%। পুরুষের ক্ষেত্রে তা মাত্র ৮.৫%।

খ. গ্রুপ টু : নিয়ন্ত্রণযোগ্য ঝুঁকিসমূহ–চেষ্টা করলে এই রিস্ক ফ্যাক্টরগুলো নিয়ন্ত্রণে আনা যায়। এগুলি যথাক্রমে–

১. হাইপারটেনশন বা উচ্চরক্তচাপ
২. রক্তে কোলেস্টেরলের উচ্চমাত্রা
৩. ধূমপান
৪. ডায়াবেটিস
৫. মানসিক ও শারীরিক চাপ ।

হাইপারটেনশন থাকলে হার্ট অ্যাটাকের আশঙ্কা বেশি থাকে। কারণ উচ্চরক্তচাপে আমাদের করোনারি আর্টারিগুলো শক্ত হতে থাকে এবং এই শক্ত আর্টারিতে 'ব্লক' হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। যাঁদের হাই-কোলেস্টেরল আছে, তাঁদের মধ্যেও হার্ট অ্যাটাকের আশঙ্কা রয়েছে। কোলেস্টেরল বেশি হলে হাই ব্লাডপ্রেসারের মতো করোনারি আর্টারিতে চর্বি জমা হতে থাকে। ফলে ভবিষ্যতে করোনারি আর্টারিতে ব্লক হওয়ার গুরুতর আশঙ্কা থেকেই যায়। কোলেস্টেরলের নিরাপদ মাত্রা হচ্ছে ২০০ এর নিচে। ২০০ থেকে ২৫০ হলে কিছুটা ঝুঁকি থেকে যায়। ২৬০ -এর উপর হলে হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা প্রবল। ধূমপানের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, যারা ধূমপান করেন না, তাদের তুলনায় যারা ধূমপান করেন, তাদের মধ্যে হার্ট অ্যাটাকের মাত্রা বেশি। তামাক এবং ধূমপান হার্ট-অ্যাটাকের সম্ভাবনা সাধারণভাবে দ্বিগুণ করে আর অতিরিক্ত ধূমপায়ী নারীদের বেলায় তা বেড়ে যায় ৪ গুণ। এও দেখা গেছে, যাঁরা অল্পবয়সে ধূমপান শুরু করেছেন, বহুক্ষেত্রে তাঁদের অল্পবয়সেই হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। তাছাড়া ধূমপায়ীরা যেমন নিজেদের ক্ষতি করেন, তেমনই অন্যের ক্ষতিও করে থাকেন। এই ধরনের ধূমপানকে বলা হয় Passive smoking বা 'পরোক্ষ ধূমপান'। ধূমপান করে না, কিন্তু ধূমপায়ীদের আশে-পাশে অবস্থানকারীদের হৃদরোগের ঝুঁকি বেড়ে যায় শতকরা ৩০ ভাগ।

হঠাৎ করে মানসিক চাপ ও শারীরিক পরিশ্রম করলেও হার্ট অ্যাটাকের আশঙ্কা বাড়ে। ডায়াবেটিস হলে করোনারি আটারিতে চর্বি জমা হয়ে ব্লক তৈরি হয়। এর ফলে হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা প্রবল মাত্রায় থাকে।

গ. গ্রুপ থ্রি : এতে রয়েছে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কারণ। যার মধ্যে আছে শারীরিক পরিশ্রমের অভাব, বসে থেকে বা কাজ না করে মোটা হওয়া। এই দুটি কারণও হার্ট অ্যাটাকের আশঙ্কা বাড়িয়ে দেয়। এছাড়া রয়েছে Type-A personality মানুষদের কথা যেসব মানুষ খুবই উচ্চাকাঙ্ক্ষী, সারাক্ষণই কোনও না কোনও লক্ষ্যের পিছনে ছুটছেন, সেইসব উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষদের মধ্যে হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা বিস্তর। তবে আপনি যদি পুরুষ হন এবং আপনার যদি এগুলোর কোনও একটা থাকে, তবে আপনার হার্ট অ্যাটাকের আশঙ্কা দ্বিগুণ। রিস্ক ফ্যাক্টর থাকলে হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা অবশ্যই সাতগুণ হয়ে দাঁড়ায়।

হার্ট অ্যাটাকে আক্রান্ত ব্যক্তির প্রথমে বুকের ঠিক মাঝখানে যন্ত্রণা শুরু হয়। তারপর তা সারা বুকে ছড়িয়ে পড়ে। এরপর বুক থেকে পিঠ, ঘাড়, পেট, এমনকি চিবুকেও যন্ত্রণা ছড়িয়ে যায়। সাথে সাথে শুরু হয় শ্বাসকষ্ট এবং মাথাও ঘুরতে শুরু করে। এছাড়া কিছুটা হাঁটলে বুকে যন্ত্রণা অনুভব, হাঁটতে হাঁটতে দাঁড়িয়ে পড়লে ব্যথা কমে যাওয়া, বেশিক্ষণ পরিশ্রম করলে যে যন্ত্রণা হতো, এখন কম পরিশ্রম করলেও সেই একই যন্ত্রণা হওয়া, কোনও পরিশ্রম না করে বসে থাকলে, এমনকি বিছানায় চুপচাপ শুয়ে থাকলেও যন্ত্রণা, হালকা হালকা ঘাম হওয়া, খাওয়া দাওয়ার পর পেটে গ্যাস হয়ে বুকের উপর দিকে ঠেলে ওঠা ইত্যাদি উপসর্গও দেখলে বুঝা যায় যে, হার্ট অ্যাটাক হতে পারে। আবার অনেক ক্ষেত্রে কোনও রকম আগাম পূর্বাভাস ছাড়াই হার্ট অ্যাটাক তার মরণ ছোবল মারতে পারে।

এই ধরনের হৃদরোগীদের হৃদযন্ত্রের বর্তমান পরিস্থিতি কী, তা খতিয়ে দেখবার জন্য প্রথমেই কিছু পরীক্ষা করতে দেয়া হয়। যার মধ্যে ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম (ইসিজি) অন্যতম। এছাড়া চেস্ট এক্সরের পাশাপাশি রক্তপরীক্ষা করে সুগার, কোলেস্টেরল, লিপিড প্রোফাইল, ইউরিয়া, ক্রিয়েটিনিন, ইউরিক অ্যাসিড এবং অন্যান্য পরীক্ষা করা হয়ে থাকে। এছাড়া মূত্র-পরীক্ষাও করা হয়। চিকিৎসক যদি প্রয়োজন মনে করেন, তবে ইকোকার্ডিওগ্রাম করতে পারেন। কারণ হৃদযন্ত্রের কোনও ত্রুটি থাকলে, তা এই পরীক্ষায় ধরা পড়ে। এরপর করা হয় ইটিটি বা এক্সারসাইজ টলারেন্স টেস্ট (স্ট্রেস টেস্ট)। এই পরীক্ষায় রোগীকে এক্সারসাইজ করতে দিয়ে ঐ অবস্থায় ইসিজি করা হয়। এক্সারসাইজ টেস্টে যদি অস্বাভাবিক কিছু ধরা পড়ে, তখন করোনারি এনজিওগ্রাম করা হয়ে থাকে। এনজিওগ্রাম করলে আর্টারির কোনও জায়গায় ব্লক থাকলে, তা পরিষ্কারভাবে দেখা সম্ভব।

বুকের ব্যথা হলে সাধারণত দেখা যায় গ্যাসট্রিক মনে করে ব্যথা নিবারণের চেষ্টা করেন। আবার অনেকে ডাক্তার/চিকিৎসককে খবর/কল দিয়ে বাড়িতে অপেক্ষা করতে থাকেন। এই ধরনের কালক্ষেপণ রোগীদের জন্য ভীষণ ক্ষতির কারণ হয়ে

থাকে। যদি কখনও কারো বুকে ব্যথা কিংবা যে কোনো ধরনের সমস্যাই হয়ে থাকুক না কেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাকে নিকটস্থ কোনো চিকিৎসক/নার্সিং হোম/ ক্লিনিক/ হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। যদি সম্ভব হয় এসপিরিন জাতীয় ওষুধ দেয়া যেতে পারে। ডাক্তারকে কল করে অযথা রোগীর জীবনের কোনো রকম ক্ষতি করতে যাবেন না। কেননা এই সময়কালে রোগীর মৃত্যুও হতে পারে। মনে রাখবেন বুকের ব্যথা শুরু হওয়ার প্রথম ছয় ঘন্টা রোগীর জন্য খুবই ঝুঁকিপূর্ণ সময়। যদি এই সময়ের মধ্যে হৃদরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে রোগীকে নেয়া হয় তবেই হার্ট অ্যাটাকের মৃত্যু থেকে বাঁচার সম্ভাবনা থাকতে পারে।

হার্ট অ্যাটাকের পর

হার্ট অ্যাটাক হচ্ছে- হঠাৎ মৃত্যুর এক নম্বর কারণ। সুতরাং একবার যিনি হার্ট অ্যাটাক হওয়ার পর মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেলেন তার মনে এ বিষয়ে হাজারো প্রশ্ন আসবে এবং তিনি এর কারণ খুঁজতে চাইবেন এটাই স্বাভাবিক। যার একবার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে তিনি অবশ্যই জানেনও যে এটা কতটা ভয়াবহ অভিজ্ঞতা। সুতরাং এরপর ডাক্তার যদিও প্রতিনিয়তই বলে থাকেন যে ভয়ের কোনো কারণ নেই বা আপনি শিগগীরই সুস্থ হয়ে উঠবেন কিন্তু তারপরও মনের মধ্যে একটা উদ্বেগ বা ভয় থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। তবে এটা ঠিক যে হার্ট অ্যাটাকের পর সঠিক চিকিৎসার মধ্যে থেকে যতদিন পার হবে আপনার হার্ট তত বেশি সুস্থ হবে। আপনিও ফিরে পাবেন হারানো শক্তি এবং কর্মক্ষমতা।

আপনি অবশ্যই জেনে সুখী হবেন যে হার্ট অ্যাটাকের পরিণতি এখন আর শুধু অস্বাভাবিক মৃত্যু নয়। হাজার হাজার মানুষ কিন্তু আবার সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক কাজ কর্মে ফিরে যাচ্ছেন। তাদের জীবনটাকে আনন্দময় এবং উপভোগও করছেন। সুতরাং আপনি এক্ষেত্রে একা নন এবং হার্ট অ্যাটাক থেকে সেরে উঠার ব্যাপারে আপনি অবশ্যই আত্মবিশ্বাসী হতে পারেন, যদি নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর আপনার জানা থাকে–

১. হার্ট অ্যাটাক কেন হলো?

হার্ট অ্যাটাক যে কোনো সময়েই হতে পারে যেমন কর্মক্ষেত্রে বা খেলার মাঠে, ঘরে বিশ্রামের সময় বা সাংসারিক কাজে ব্যস্ত থাকাবস্থায়। হার্ট অ্যাটাক হয় হঠাৎ করে কিন্তু এর প্রক্রিয়া শুরু হয়ে থাকে অনেক আগে থেকে। হার্ট অ্যাটাক হয় সাধারণত যে রক্তনালী দিয়ে হার্টের মাংসপেশীতে রক্ত সঞ্চালিত হয় সেই রক্তনালীতে অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিসের কারণে। অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস তৈরি হয় ধীরে ধীরে এবং এটা একটি জটিল প্রক্রিয়া।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন রক্তনালীর ভিতরের আবরণে ক্ষতের কারণে অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিসের প্রক্রিয়া শুরু হয়। এটা শুরু হলেই কোলেস্টেরল বা চর্বি জাতীয় পদার্থ এবং রক্তে প্রবহমান অন্যান্য পদার্থ জমা হতে থাকে রক্তনালীর গায়ে। ফলে রক্তনালী সরু হতে থাকে এবং রক্ত চলাচল ক্রমশই দুরূহ হয়ে উঠে।

যদি হার্টের রক্তনালীতে বা করোনারি আর্টারিতে রক্ত জমাট বেঁধে রক্তনালী বন্ধ হয়ে যায় তবে হার্টের ওই নির্দিষ্ট মাংসপেশী প্রয়োজনীয় রক্ত পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়। ফলশ্রুতিতে হয় হার্ট অ্যাটাক। রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে হার্টের ওই নির্দিষ্ট মাংসপেশীর মৃত্যু হওয়া বা পচে যাওয়াকেই মেডিকেলের পরিভাষায় বলে মাইয়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন বা হার্ট অ্যাটাক।

২. কিভাবে হার্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এই ক্ষত হার্টের স্বাভাবিক কাজে কি প্রভাব ফেলে?

হার্ট অ্যাটাক হলে হার্টের বিশেষ একটা অংশ নষ্ট হয়ে বা পঁচে যায়। কারণ ঐ বিশেষ অংশে বিশুদ্ধ রক্ত সঞ্চালিত হয় না ফলে ঐ জায়গায় মাংসপেশী অক্সিজেন থেকে বঞ্চিত থাকে। তবে হার্টের গঠনগত কারণেই এর একটি অংশ নষ্ট হয়ে গেলেও বাকী অংশ কাজ করতে পারে। তবে ঐ ক্ষত শুকাতে কিছুটা সময় লাগে। একবার ভাবুন একজন এথলেটের কথা। দৌঁড়াতে গিয়ে যার এক পায়ের মাংসপেশী ছিঁড়ে গেল। ছিঁড়ে যাওয়া মাংসপেশী জোড়া লাগার পর তার ক্ষত শুকানো পর্যন্ত ঐ এথলেটকে অবশ্যই পূর্ণবিশ্রামে থাকতে হবে। বিশ্বসেরা ক্রিকেটার শচীন টেন্ডুলকারের কথা নিশ্চয়ই জানেন–তার টেনিস এলবো'র কারণে মাসের পর মাস মাঠের বাইরে থাকতে হয়েছে, লক্ষ্য একটাই সুস্থ হয়ে মাঠে ফিরে আবার আগের মতো ক্রিকেট বিশ্বকে শাসন করা।

সুতরাং ছিঁড়ে যাওয়া পায়ের মাংসপেশী জোড়া লাগতে যেমন সময় লাগে এবং এই সময় আপনাকে বিশ্রামেই কাটাতে হয়। হার্ট অ্যাটাকের ক্ষেত্রেও হার্টের ক্ষত বা নষ্ট হয়ে যাওয়া মাংসপেশীর ক্ষত শুকানোর জন্য আপনাকে সম্পূর্ণ বিশ্রামে থাকতে হবে। হার্টের ক্ষত বাইরে থেকে দেখা যায় না বলে তাকে তুচ্ছ করলে ভুল করা হবে। যখন হার্ট তার ক্ষত সারিয়ে সুস্থ হয়ে উঠবে এবং আপনাকে ডাক্তার অনুমতি দেবেন তখনই আপনি আস্তে আস্তে আবার স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরে যেতে পারবেন। সাধারণত এই সেরে উঠার প্রক্রিয়া শেষ হতে প্রায় ৪ থেকে ৬ সপ্তাহ সময় লাগে। তবে এই সময় কত দীর্ঘ হবে তা নির্ভর করে ক্ষতের গভীরতা এবং আপনার নিজস্ব সুস্থতার গতি হারের উপর। সে কারণেই ডাক্তার একেক জন রোগীর ক্ষেত্রে একেক রকম সময় এবং শারীরিক শ্রমের পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

৩. হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফেরার পর ও কেন দুর্বল লাগে?

হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে থেকে যদি আপনি পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিয়ে থাকেন তবে বাড়িতে ফিরে গিয়ে আপনি কিছুটা দুর্বল অনুভব করতেই পারেন। এটা শুধুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত বা দুর্বল হার্টের কারণে নয়। বরং এই দুর্বলতা দীর্ঘস্থায়ী হাসপাতালের বেডে শুয়ে থাকার কারণে। আপনার নিষ্ক্রিয় মাংসপেশী এই সময়কালে শতকরা ১৫ ভাগ শক্তি কম করেছে। এই মাংসপেশীগুলো তাদের হারানো শক্তি ফিরে পায় শুধুমাত্র নিয়মিত শারীরিক ব্যায়ামের মাধ্যমে। তবে নিয়মিত ব্যায়াম করলেও মাংসপেশীগুলোর পূর্বের চেহারা ফিরে পেতে প্রায় ২-৬ সপ্তাহ লাগে।

৪. আবার কি স্বাভাবিক জীবনযাপন করা সম্ভব?

অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় হার্ট অ্যাটাকের কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই রোগী তার পূর্বের স্বাভাবিক কাজ-কর্মে ফিরে যেতে পারেন। হার্টের ক্ষত যদি খুব বড় বা গভীর না হয় তাহলে খুব তাড়াতাড়ি হার্ট তার রক্ত সঞ্চালনের কাজ পূর্বের মতো করতে পারে। সুতরাং আপনাকে স্বাভাবিক কাজ-কর্ম বাদ দিয়ে ঘরে বসে থাকার প্রয়োজন নেই বরং আপনার জীবনধারার কিছু পরিবর্তনের মাধ্যমে হার্ট অ্যাটাকের বিভিন্ন জটিলতা এড়িয়ে চলার দিকে মনোযোগী হতে হবে। বেশিরভাগ হার্ট অ্যাটাকের রোগীই এখন তাদের প্রথম অ্যাটাকের পর সেরে উঠছেন এবং ৪-৬ সপ্তাহের মধ্যেই আস্তে আস্তে স্বাভাবিক কাজ-কর্ম করে পূর্বের ন্যায় কর্মমুখর জীবন উপভোগ করছেন।

শতকরা ৮০-৯০ ভাগ হার্ট অ্যাটাক থেকে বেঁচে যাওয়া রোগী তাদের পূর্বের কাজে ফিরে যেতে পারেন ২ থেকে ৩ মাসের মধ্যে। কেউ কেউ ২ সপ্তাহ পরই কাজে যোগদান করতে পারেন। যদিও তাদের কাজে ফিরে যাওয়া নির্ভর করে দুটি বিষয়ের উপর–

ক. হার্টের ক্ষত কত বড় বা গভীর?

খ. কাজের ধরনটা কেমন অর্থাৎ কাজটা কত বেশি শারীরিক শ্রম দাবি করে?

সুতরাং এই দুটি বিষয় বিবেচনায় রেখে সিদ্ধান্ত নিতে হবে আপনি আপনার পূর্বের কাজে ফিরে যাবেন নাকি নতুন কোনো কাজ বা পেশা খুঁজবেন। তবে এক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশে হৃদরোগ পুনর্বাসন কেন্দ্র রয়েছে। চিকিৎসকগণ অনেক সময় হার্ট অ্যাটাক থেকে বেঁচে যাওয়া রোগীদের সেসব পুনর্বাসন কেন্দ্রে পাঠিয়ে তাদের কর্মক্ষমতা যাচাই করে তারপর তাদের পরবর্তী পেশা নির্বাচনের পরামর্শ দিয়ে থাকেন। আমাদের দেশে যদিও সেরকম পুনর্বাসন কেন্দ্র খুব একটা গড়ে উঠে নি তবে ভবিষ্যতে হবে বলে আমার ধারণা।

৫. স্বাভাবিক কাজ শুরু পরও কি বিশ্রামের প্রয়োজন আছে?

অবশ্যই আপনার পরিমিত বিশ্রাম প্রয়োজন কিন্তু শারীরিক শ্রম বা সামাজিক কাজ কর্ম সবকিছুই সমাজের অন্যান্যজনের মতো আপনার জন্যও সমান উপযোগী। অনেক সময় ডাক্তারেরা হার্ট অ্যাটাক থেকে সেরে উঠা রোগীদের একটু বেশি শারীরিকভাবে কর্মঠ থাকতে পরামর্শ দিয়ে থাকেন। রাতে ভালো ঘুম সবার জন্যই প্রয়োজন তবে হার্ট অ্যাটাক থেকে সেরে উঠা রোগীদের জন্য আরও বেশি দরকার। মাঝে মাঝে দুপুরে অল্প সময়ের বিশ্রাম শরীরের জন্য ভালো। এইরকম রোগীদেরকে অবশ্যই কাজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে যাওয়ার আগেই বিশ্রাম নেয়া জরুরি।

৬. হার্ট অ্যাটাক পরবর্তী কি কি অনুভূতিগুলো হওয়া স্বাভাবিক?

হার্ট অ্যাটাকের পর একজন রোগীর নানা ধরনের বিচিত্র আবেগ এবং অনুভূতি হয়ে থাকে তবে তার মধ্যে ভয়, রাগ এবং বিষণ্ণতা অন্যতম। সবচেয়ে বেশি যে অনুভূতিটা লক্ষ্য করা যায় তা হলো ভয়। সাধারণত হার্ট অ্যাটাকের পর যে চিন্তাগুলো বেশি মনে আসে তা হলো–'আমি কি মরে যাব? আমি কি সত্যি বেঁচে আছি?' হার্ট অ্যাটাকের সময় যে তীব্র বুকে ব্যথা বা শ্বাসকষ্ট হয়েছিল–ওরকম ব্যথা বা শ্বাসকষ্ট আবার দেখা দেবে কিনা? শারীরিক উপসর্গও অনেক সময় মনে ভয় জাগায় যেমন–হার্ট অ্যাটাকের পূর্বে বুকের আশে পাশের ছোটখাটো ব্যথাকে আগে হয়তো পাত্তাই দেন নি কিন্তু এখন বুকে যে কোনো ধরনের হালকা ব্যথা বা চাপকেও ভয় লাগে–এই বুঝি আবার অ্যাটাক হয়ে গেলো। যদিও এই চিন্তাগুলো অস্বস্তিকর তবুও এগুলো এড়ানো যায় না। তবে সময়ের সাথে সাথে সব দুশ্চিন্তাই দূর হয়ে যায়।

রাগ হওয়া বা উত্তেজিত হওয়া আরেকটি বড় বিষয় যা আমরা প্রায়শই দেখে থাকি। রোগী এক্ষেত্রে চিন্তা করে–কেন আমারই হার্ট অ্যাটাক হলো? রোগীর জন্য এসময়টা অবশ্যই দুঃসময়। এইসময় সে তার ধৈর্য হারিয়ে ফেলতে পারে। যদি তাঁর পরিবার, বন্ধু-বান্ধব সবার থেকে আশানুরূপ সহানুভূতি না পায় তখন অনেক ক্ষেত্রে জীবনের প্রতি অনীহা চলে আসতে পারে। এরকম চিন্তাও অনেকের মধ্যে কাজ করে যে, সে বোধ হয় আর আগের মত স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারবে না। কিংবা আগের মতো পরিশ্রম করতে পারবে না। পরিবারের জন্য, ছেলে-মেয়েদের জন্য হয়তো কিছু করে যেতে পারবে না অথবা সে যে স্বপ্ন এতদিন দেখে এসেছে সেগুলো বোধ হয় আর পূরণ হবে না। এইসব চিন্তা থেকে একধরনের বিষণ্ণতা বাসা বাঁধে মনে। যদিও এই চিন্তাগুলো খুবই স্বাভাবিক এবং যেকোন

মানুষের মনেই এগুলো আসতে পারে তথাপি এক্ষেত্রে আপনাকে খারাপ পরিণতির চিন্তা মাথা থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করতে হবে। ধৈর্যধারণ করুন এবং নিজেকে একটু সময় দিন সেরে ওঠার জন্য।

সর্বোপরি অনেকে তাদের যৌনজীবন নিয়ে চিন্তিত হয়ে থাকেন। কেননা দীর্ঘদিন অসুস্থ অবস্থায় যৌনমিলন থেকে বিরত থাকার কারণে প্রাথমিকভাবে অনেকেই নিজেকে দুর্বল ভাবতে থাকেন বা সাময়িকভাবে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন। যদি এরকম অবস্থার সম্মুখীন হন তবে অবশ্যই আপনার স্ত্রী/স্বামীকে সাথে নিয়ে ডাক্তারের সাথে খোলামেলাভাবে সমস্যা নিয়ে আলোচনা করুন। মনে রাখবেন অধিকাংশ মানুষই হার্ট অ্যাটাকের ৪-৬ সপ্তাহের মধ্যেই তাদের স্বাভাবিক যৌন জীবনে ফিরে যেতে পারেন। সাধারণত হার্ট অ্যাটাকের থেকে ৬ মাসের মধ্যেই এ সব অনুভূতিগুলো পুরোপুরি চলে যায়। সুতরাং এই সময়ে আপনাকে যেমন ধৈর্য ধরতে হবে তেমনি পরিবারের সদস্য এবং বন্ধু-স্বজনদের আরও বেশি সহানুভূতিশীল হওয়ার দরকার যাতে করে এই দুঃসময়টা পার করতে পারেন। তবে প্রয়োজনে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিতে পারেন।

হার্ট অ্যাটাকের পর বুকের ব্যথা

হার্ট অ্যাটাকের পর সবারই বুকের ব্যথা হবে এমন নয়। তবে অনেক সময় হতেই পারে এবং এই ব্যথাকে Post MI Angina বলা হয়। এনজিনা হলো বুকে হালকা ব্যথা বা চাপ অনুভব করা এবং এটা হয় যখন আপনার হৃদপিণ্ডের মাংসপেশীর কোন অংশে তার কাজের চাহিদা মতো রক্ত সঞ্চালিত হয় না। সুতরাং এনজিনা সাধারণত দেখা যায় শারীরিক পরিশ্রমের পর মানসিক উত্তেজনা হলে বা পেট ভরে খাবার খেলে। যদি আপনার এরকম এনজিনার অ্যাটাক হয় তবে ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে ঔষধ খেলেই ব্যথা কমে যাবে।

হার্ট অ্যাটাকের পর কি করা উচিত

- ধূমপান বন্ধ করুন।
- আপনার ওজনের প্রতি নজর রাখুন এবং অবশ্যই ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখুন।
- চর্বিযুক্ত খাবার পরিহার করুন। এর মাধ্যমে রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা কমিয়ে আনুন। রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা কমে গেলে পুনরায় হার্ট অ্যাটাক এবং স্ট্রোকের ঝুঁকি কমে যাবে।
- নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম বা ব্যায়াম করুন।

উচ্চরক্তচাপ হার্ট অ্যাটাক এবং স্ট্রোকের প্রধান ঝুঁকির কারণ। সুতরাং নিয়মিত রক্তচাপ পরীক্ষা করিয়ে তা নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। প্রয়োজনে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে বা নিয়মিত ব্লাড প্রেসার কমানোর ঔষধ খেতে হবে।

- যদি আপনি পূর্বে অ্যালকোহল খেতে অভ্যস্ত না হন তবে তা আর কখনোই শুরু করবেন না। অতিরিক্ত মদ্যপানের কারণে স্ট্রোক, উচ্চরক্তচাপ, ওজন বেড়ে মোটা হয়ে রক্তে ট্রাইগ্লিসারাইড মাত্রা বেড়ে যায়। আপনি যদি ওজন কমাতে চান তবে মদ্যপান থেকে বিরত থাকাই উত্তম। মনে রাখবেন এলকোহলসমৃদ্ধ পানীয়তে ক্যালরির পরিমাণ বেশি থাকে।
- আপনার ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখুন।
- আপনার ডাক্তারের পরামর্শ মতো নিয়মিত কিছু ঔষধ খেতে হবে যার মধ্যে এসপিরিন ও কোলেস্টেরল কমানোর জন্য স্ট্যাটিন গ্রুপের ঔষধ অন্যতম।

শেষ কথা

মনে রাখবেন, ডায়াবেটিস বা উচ্চরক্তচাপের রোগীদের যেমন নিয়মিত ঔষধ খেতে হয়। হার্ট অ্যাটাকের পরও কিছু কিছু ঔষধ নিয়মিত খেয়ে যেতে হয়। আর এর অন্যথা হলেই হার্ট ফেইলিউরের মতো জীবনহানিকর অবস্থার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা বহুগুণ বেড়ে যায়।

হৃদরোগ ও দাম্পত্যজীবন

আপনার বা আপনার প্রিয়জনের কি হৃদরোগ আছে? আপনার কি কখনো হার্ট অ্যাটাক অথবা হার্টের অপারেশন হয়েছিলো? যদি হয়ে থাকে তবে নিশ্চয়ই আপনি আপনার যৌনক্ষমতা বা পুনরায় স্ত্রী/স্বামী সহবাস শুরু করার ব্যাপারে চিন্তিত?

কোনো রকম দুঃশ্চিন্তার কারণ নেই। কেননা আপনার জন্য সুসংবাদ হলো- আপনি এখনও সহবাসের আনন্দকে পুরোপুরি উপভোগ করতে পারেন।

অনেকে মনে করেন সেক্স মানেই যৌন মিলন কিন্তু সেক্স শুধু এতটুকুতেই সীমাবদ্ধ থাকে না বরং এর বাইরেও কিছু আছে। আপনি আপনার ইচ্ছা বা অনুভূতি প্রকাশ করতে পারেন নানাভাবে। যেমন আপনি আপনার প্রিয়জনের স্পর্শ বা তার সঙ্গ উপভোগ করার মাধ্যমেও সেই আনন্দটুকু পেতে পারেন।

যৌনক্রিয়ার সময় মানুষের শরীরে কিছু পরিবর্তন দেখা যায়। যেমন–

১. প্রাথমিক অবস্থায়-শ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত হতে থাকে, চামড়া (বিশেষ করে মুখের) রক্তিম হয়ে উঠে, হৃদস্পন্দন এবং রক্তচাপ বাড়তে থাকে।
২. আরও একটু বেশি উত্তেজিত হলে– যৌন মিলনের উদ্বেগ বাড়তে থাকে এবং হৃদস্পন্দন ও রক্তচাপ আরও বেড়ে যেতে থাকে।
৩. অরগাজমের সময় এবং পরে– সমস্ত উত্তেজনা প্রশমিত হতে থাকে এবং হৃদস্পন্দন, রক্তচাপ ও শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রমশ পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে।

এইসবগুলো প্রতিক্রিয়াই খুব স্বাভাবিক প্রক্রিয়া যদিও অনেকেই ঘটনাগুলো নিয়ে কখনো চিন্তা করে না। হার্ট অ্যাটাকের পর বা হার্টের অপারেশন পরবর্তী সময়েও উপরোক্ত প্রক্রিয়াগুলোই হয়ে থাকে। হার্ট অ্যাটাক বা অপারেশন পরবর্তী সময়ে যখনই আপনি নিজেকে প্রস্তুত মনে করবেন–তখনই দৈহিক মিলন শুরু করতে পারেন তবে অবশ্যই শুরুর পূর্বে আপনার ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন।

সাধারণত পুরুষ কিংবা মহিলা উভয়েই হার্ট অ্যাটাক বা হার্টের অপারেশনের কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই দৈহিক মিলন শুরু করেন। অনেকে আরও আগেই শুরু করেন আবার কেউ কেউ এ ব্যাপারে কিছুটা সতর্ক থাকেন। সম্ভবত রোগ নিয়ে দুঃশ্চিন্তা, বিষণ্ণতা কিংবা আগ্রহের অভাবের কারণে।

হার্ট অ্যাটাক পরবর্তী সময়ে আপনার হৃদস্পন্দন, শ্বাসপ্রশ্বাস বা শরীরের যেকোনো উপসর্গ নিয়ে আপনি একটু বেশি সচেতন বা উদ্বিগ্ন থাকবেন এটাই স্বাভাবিক। সুতরাং তা নিয়ে দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। হার্ট অ্যাটাক বা হার্টের অপারেশনের পর ভালোবাসার মানুষের একটু ছোঁয়া, একে অপরকে ধরে থাকা বা একটু মমতামাখা আদর এভাবেই শুরু হতে পারে সেক্স। হাসপাতাল থেকে বাসায় ফিরে আপনি যখন সুস্থ হয়ে উঠবেন, মানসিকভাবে আরও বেশি আত্মবিশ্বাসী হবেন তখন নিজের কাছে এবং ভালোবাসার মানুষের কাছে বেশি সহজ হতে পারবেন। আর তখনই আলতো পরশকে শরীরী মিলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারবেন অনায়াসে। দৈহিক মিলনে যেহেতু একটু বেশি শক্তির দরকার হয় তাই অনেকে এজন্য ৪-৬ সপ্তাহ সময় নেয়। তবে যেসব রোগী হার্ট অ্যাটাক পরবর্তী কোনো জটিলতা ছাড়াই হাসপাতাল ত্যাগ করেছেন তারা দ্বিতীয় সপ্তাহের মাঝামাঝি থেকে এবং যাদের হার্টের অপারেশন হয়েছে তারা সাধারণত ২ থেকে ৩ সপ্তাহ পর যৌন মিলনে যেতে পারেন। তবে দৈহিক মিলনের জন্য আপনার প্রস্তুতি নিয়ে যদি বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে তবে আপনার ডাক্তারের পরামর্শে স্ট্রেস-টেস্টের মাধ্যমে শারীরিক পরিশ্রমের ক্ষমতা যাচাই করে নিতে পারবেন। আপনার হৃদস্পন্দনের গতি, ব্লাড প্রেসারের অবস্থা দেখে আপনার ডাক্তার বলে দিতে পারবেন দৈহিক মিলনের জন্য আপনি কতটা প্রস্তুত। তবে দৈহিক মিলনের সময় যদি বুকে ব্যথা শুরু হয় তবে সাথে সাথে তা বন্ধ করে বিশ্রাম নেবেন। এই সময় জিহ্বার নিচে নাইট্রোগ্লিসারিন ট্যাবলেট বা স্প্রে দিতে পারেন। তবে অবশ্যই আপনার ডাক্তারকে অবহিত করবেন এবং তার পরামর্শ মেনে চলবেন।

কিছু কিছু মানসিক ফ্যাক্টরও যৌনমিলনের ইচ্ছা কমিয়ে দিতে পারে, যেমন : হার্ট অ্যাটাক বা অপারেশন পরবর্তী সময়ে সাধারণত–

- কিছুটা বিষণ্ণতা, দুঃখবোধ বা ভয় হতে পারে।
- অনেকসময় নিদ্রাহীনতা কিংবা ঘুমের আধিক্য দেখা দিতে পারে।
- ক্ষুধা-বৃদ্ধি অথবা ক্ষুধামন্দা দেখা দিতে পারে।
- শরীরের ওজন বাড়তে বা কমতে পারে এবং জীবনের প্রতি কিছুটা অনীহা বোধ আসতে পারে।
- সারাক্ষণ অথবা কাজের পর অবসাদ লাগতে পারে।

এই অনুভূতিগুলো খুবই স্বাভাবিক। তবে এগুলো সাধারণত দুই মাসের মধ্যেই ভালো হয়ে যায়। তবে বিষণ্ণতা দাম্পত্য জীবনে অবশ্যই খারাপ প্রভাব ফেলে। অনেকসময় কিছু কিছু ভুল ধারণা থেকেও দেখা দেয় যৌনমিলনে অনীহা। যেমন– অনেকে মনে করেন সেক্স করলে হার্টের সমস্যা হয়। ফলে হার্ট অ্যাটাকের পর অনেক দম্পতিই মাসের পর মাস তাদের যৌনজীবন থেকে দূরে থাকে। এই

পরিস্থিতিতে আপনাকে ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে ভুল ধারণা দুর করে বিষণ্নতা কাটিয়ে উঠতে হবে।

হার্ট অ্যাটাক বা অপারেশন পরবর্তী দৈহিকমিলন শুরু করার ক্ষেত্রে কিছু টিপস–

- নিয়মিত স্বাস্থ্যসম্মত খাবার খাবেন, ব্যায়াম করবেন। পরিমিত বিশ্রাম এবং ডাক্তারের পরামর্শমত ঔষধ খাবেন।
- ধূমপান ত্যাগ করুন।
- ধৈর্যশীল হওয়ার চেষ্টা করুন। অযথা তাড়াহুড়া করবেন না।
- প্রথমেই বেশি আশা করবেন না। আপনার দাম্পত্যজীবন পুনঃস্থাপন করুন আস্তে আস্তে এবং যৌনক্রিয়া স্বাভাবিকভাবে সম্পন্ন হতে দিন।
- এমন সময় বেছে নিন যখন আপনারা দুজনেই ভারহীন, দুঃশ্চিন্তামুক্ত থাকবেন।
- খাবারের পর কমপক্ষে দুই থেকে তিন ঘন্টা পর দৈহিকভাবে মিলিত হবেন।
- দৈহিক মিলনের জন্য পরিচিত এবং শান্ত জায়গা বেছে নিবেন।
- সহবাসের পূর্বেই আপনার ডাক্তারের দেয়া ঔষধগুলো খেয়ে নিবেন।

হার্ট ফেইলিউর-এর সাথে বসবাস

ডাক্তারি পরিভাষায় হার্ট ফেইলিউর শব্দের অর্থ না জানলে ব্যাপারটাকে খুবই ভয়াবহ বলে মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক। যদি ডাক্তার বলেন যে, আপনার হার্ট ফেইলিউর হয়েছে তার মানে এই নয় যে, আপনার হার্ট বিট বন্ধ হয়ে গেছে বা আপনি এখনই মারা যাচ্ছেন।

হার্ট ফেইলিউর একটি দীর্ঘমেয়াদী এবং ক্রমাবনতিশীল রোগ এবং এই রোগ সাধারণত পুরোপুরি নিরাময় হয় না। তবে আশার কথা হলো এখন অনেক রকম চিকিৎসা পদ্ধতির সাহায্যে এই রোগের ক্রমাবনতিকে ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব। হার্ট ফেইলিউর অনেক ক্ষেত্রে কোনো রকম আগাম চিহ্ন বা উপসর্গ ছাড়াই দেখা দিতে পারে বা ভয়াবহ পর্যায়ে চলে যেতে পারে। সে কারণেই আপনার জন্য এটি জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, কিভাবে হার্ট ফেইলিউরকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।

প্রায় সব ধরনের হার্টের রোগ থেকেই হার্ট ফেইলিউর হতে পারে। তবে এর মধ্যে উচ্চ রক্তচাপ এবং করোনারি আর্টারি ডিজিস থেকে হার্ট অ্যাটাকের কারণে হার্ট ফেইলিউর এর ঘটনাই সামগ্রিকভাবে বেশি।

হার্টের কাজ

হার্টের প্রধান কাজ হলো সঠিক পরিমাণ রক্ত পাম্প করে শরীরের বিভিন্ন অংশে পৌছিয়ে দেয়া যাকে বলে রক্ত সঞ্চালন বা সার্কুলেশন। এই সঞ্চালিত রক্ত শরীরের টিস্যুগুলিতে তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য এবং অক্সিজেন পৌছে দেয় এবং টিস্যুগুলি থেকে বর্জ নিষ্কাশন করে। হার্ট প্রতিবারে কতটুকু রক্ত পাম্প করবে তা নির্ভর করে শরীরের প্রতি অংশে কতটুকু রক্ত প্রয়োজন তার উপর। সাধারণত আপনি যখন বিশ্রামে থাকেন তখন আপনার শরীরে রক্তের প্রয়োজন কম হয়। আর অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রমের সময় বা ব্যায়ামের সময় শরীরের বিভিন্ন অংশ এবং টিস্যুগুলোতে রক্তের প্রয়োজনীয়তা মেটাতেই হৃদস্পন্দন কখনো দ্রুত বা ধীরে হয় এবং রক্তনালীগুলো প্রয়োজনীয় রক্ত সঞ্চালনের জন্য প্রসারিত কিংবা সংকুচিত হয়।

তবে শুধুমাত্র শারীরিক পরিশ্রমের সময়ই হার্টকে বেশি কাজ করতে হয় তা নয় আরও অনেক ক্ষেত্রে, যেমন–জ্বর বা অনেক অসুখের সময়ও হার্টের কাজ বেড়ে যায় যাতে করে সে অতিরিক্ত অক্সিজেন বা খাদ্য শরীরের বিভিন্ন অংশে পৌছে দিতে পারে। তবে স্বাভাবিক অবস্থায় শরীরের বিভিন্ন অংশে পর্যাপ্ত রক্ত সঞ্চালন নিশ্চিত করতে যতটুকু রক্তের প্রয়োজন তা একটি সুস্থ হার্টে থাকে।

হার্ট ফেইলিউরের কারণ

সাধারণত যে যে কারণে হার্ট ফেলিউর হয় তা হলো–

- করোনারি আর্টারি ডিজিজ–যে সকল রক্তনালী দিয়ে হার্টের মাংশপেশীতে রক্ত সঞ্চালিত হয় সেগুলো যদি কোনো কারণে সরু বা বন্ধ হয়ে যায়।
- উচ্চরক্তচাপ।
- পূর্বে হার্ট অ্যাটাক বা মাইয়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশান হয়ে থাকলে।
- হার্টের ভাল্বের ত্রুটি বা রোগ থাকলে।
- হার্টের মাংশপেশীর রোগ–যাকে বলে কার্ডিওমায়োপ্যাথি।
- জন্মগতভাবে হার্টে যদি কোনো ত্রুটি থাকে বা জন্মগত হৃদরোগ থাকে।
- হার্টের ভাল্ব বা মাংশপেশীর সংক্রমণ থাকলে যাকে যথাক্রমে এন্ডোকার্ডাইটিস এবং মায়োকার্ডাইটিস বলে।
- অতিরিক্ত শারীরিক ওজন বা স্থূলতা।
- ডায়াবেটিস।
- কিছু অস্বাভাবিক হৃদস্পন্দন।
- থাইরয়েড হরমোনজনিত সমস্যা।
- বিষ জাতীয় দ্রব্য যেমন–এলকোহল, কিছু বিশেষ কেমোথেরাপির ওষুধ ইত্যাদি।

উপরোল্লেখিত প্রত্যেকটি রোগের কারণেই হার্ট ফেইলিউর হতে পারে নিম্নোক্ত উপায়ে, যেমন–

১. হার্টের রক্ত পাম্প করার ক্ষমতা কমে গিয়ে

হার্টের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে রক্ত পরিপূর্ণভাবে জমা না হতে পারায় অথবা হার্টের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে অতিরিক্ত পরিমাণে রক্ত জমা হওয়ার ফলে।

তবে এই সমস্যার অনেকগুলোই বছরের পর বছর ধরে থাকতে পারে। হার্ট ফেইলিউরের কিছু কিছু প্রাথমিক উপসর্গ প্রথমে দেখা দিতে পারে। তবে সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা না পেলে তা মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনতে পারে।

হার্ট ফেইলিউর হলে কি হয়?

হার্ট যখন পূর্ণশক্তিতে পাম্প করতে পারে না তখন প্রতিটি হৃদস্পন্দন বা হার্ট বিটের সাথে স্বাভাবিকের তুলনায় কম রক্ত বের হবে এবং শরীরে প্রবাহিত হবে। এরপর রক্তগুলো আবার হার্টে ফিরে আসে শিরার ভিতর দিয়ে ফলে টিস্যুগুলো থেকে রক্ত ক্রমে জমা হয় শিরায়। এখন যেহেতু হার্ট স্বাভাবিকের তুলনায় কম রক্ত পাম্প করে ফলে শিরায় রক্তের পরিমাণ বেড়ে গিয়ে এক পর্যায়ে রক্ত শিরা থেকে আবার টিস্যুতে জমা হতে থাকবে। ফলে শরীরের বিভিন্ন অংশে পানি বা তরল পদার্থ জমা হয়, যাকে বলে ইডিমা (Edema)। পায়ের আঙ্গুল, পায়ের পাতা, গোড়ালী, পা, পেটে এবং অন্যান্য টিস্যু ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ইডিমা হতে পারে। সব ইডিমাই হার্ট ফেইলিউরের কারণে হয় তা নয়। কেবল মাত্র ডাক্তারই এর সঠিক কারণ নির্ণয় করতে পারেন।

স্বাভাবিক অবস্থায় হার্টের বামপাশের প্রকোষ্ঠগুলোতে ফুসফুস থেকে বিশুদ্ধ রক্ত এসে জমা হয় এবং সেখান থেকে সারা শরীরে পাম্পের মাধ্যমে রক্ত সঞ্চালিত হয়ে থাকে। তবে বাম নিলয় প্রয়োজন অনুযায়ী পাম্প করতে না পারলে রক্ত পুনরায় ফুসফুসে ফিরে যায়। মাঝে মাঝে তরল পদার্থ রক্তনালী থেকে বেরিয়ে ফুসফুসের ফাঁকা জায়গায় জমা হতে থাকে। এ অবস্থাকে পালমোনারি ইডিমা বলা হয়ে থাকে। যার ফলে রোগীর শ্বাসকষ্ট হয় এবং ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

কিডনি শরীর থেকে কতটা সোডিয়াম/লবণ এবং পানি বের করে দিবে তা নির্ভর করে তার হার্ট কতটা ভালোভাবে কাজ করছে। স্বাভাবিক অবস্থায় যেখানে সোডিয়াম প্রস্রাবের সাথে নির্গত হয়, হার্ট ফেইলিউরের সময় তা শরীরে থেকে যায় এবং পানি ধরে রাখে। শরীরে অতিরিক্ত পানি জমে যাওয়া একটি সমস্যা, যার ফলে শরীরের ওজন যেমন বেড়ে যায় তেমনি শারীরিক অবস্থারও ক্রমশ অবনতি হতে থাকে।

সবশেষে হার্ট ফেইলিউরের রোগী ক্রমশ অবসন্ন হতে হতে প্রচণ্ড দুর্বল হয়ে পড়ে। হার্ট রক্ত সঞ্চালন সঠিকভাবে করতে না পারায় শরীরের বিভিন্ন অংশে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন ও পুষ্টি উপাদানের অভাবের কারণে এই অবস্থা হয়। এ কারণেই খাওয়ার পর রোগীর ঘুম ঘুম ভাব চলে আসে, হাঁটতে গেলে দুর্বল লাগে এবং একটু পরিশ্রম করলেই শ্বাস ফেলতে কষ্ট হয়।

হার্ট ফেইলিউরের উপসর্গ

- সবচেয়ে প্রধান এবং পরিচিত উপসর্গ হলো - শ্বাসকষ্ট। ফুসফুসে পানি জমে যাওয়া অথবা হার্টের কর্মক্ষমতা কমে যাওয়ার কারণে এই শ্বাসকষ্ট হয়ে থাকে। প্রাথমিকভাবে পরিশ্রম করলে শ্বাসকষ্ট হয় তবে রোগের তীব্রতা বাড়ার সাথে সাথে বিশ্রামে থাকা অবস্থায়ও শ্বাসকষ্ট হতে পারে। অনেক সময় রাতে শোয়া অবস্থায় হঠাৎ করে শ্বাসকষ্ট বেড়ে যেতে পারে। তখন মাথার নিচে একাধিক বালিশ দিয়ে উঁচু করে দিলে তবেই কিছুটা আরাম পাওয়া যায়।
- শরীরে, বিশেষ করে পায়ে এবং পেটে পানি জমে ফুলে যেতে পারে।
- দ্রুত শরীরের ওজন বেড়ে যাওয়া।
- দুর্বলতা ও ক্লান্তিবোধ হওয়া।
- কাশি এবং অনেক সময় রক্তমিশ্রিত কফ হওয়া।
- দ্রুত অথবা অনিয়মিত হৃদস্পন্দন।
- অসংলগ্ন চিন্তা, মাথা ঘোরানো বা মাথায় হালকাভাব অনুভব করা, ক্ষুধামন্দা এবং বমিবমি ভাব।

হার্ট ফেইলিউরের রোগীর ব্যায়াম

সাধারণত এই অবস্থায় রোগীকে সচল বা কর্মতৎপর থাকতে পরামর্শ দেয়া হয়ে থাকে। কেননা এর মাধ্যমে সে সুস্থ ও আরও বেশি কর্মক্ষম থাকতে পারে।

তবে একজন হার্টফেইলিউরের রোগীকে ব্যায়াম শুরু করতে হলে অবশ্যই তার আগে ডাক্তারের পরামর্শ নেয়া উচিত। অথবা ডাক্তারের উপস্থিতিতে স্ট্রেস টেস্ট বা ই.টি.টি. (ETT) করে পরিশ্রম করার ক্ষমতা যাচাই করে নেয়া উচিত। আর ব্যায়ামের মধ্যে এরোবিক্স যেমন–হাঁটা, সাঁতার কাটা বা সাইকেল চালানো ইত্যাদি ধরনের ব্যায়ামই হার্ট ফেইলিউরের রোগীদের জন্য ভাল।

চিকিৎসা

সাধারণত হার্ট ফেইলিউরের চিকিৎসা সম্ভব। সঠিক চিকিৎসা এবং দৈনন্দিন জীবনধারায় কিছু পরিবর্তনের মাধ্যমে হার্ট ফেইলিউরের রোগী মোটামুটি ভালো বোধ করতে পারে।

হার্ট ফেইলিউর রোগীদের চিকিৎসার মুল উদ্দেশ্য হলো–

১. অবসাদ, শ্বাসকষ্ট এবং ইডিমা কমিয়ে আনা।
২. শরীরের শক্তিবৃদ্ধি এবং ব্যায়াম করার মতো শরীরকে উপযুক্ত করে তোলা।
৩. রোগের গতিকে থামিয়ে দেয়া বা মন্থর করা।
৪. সুস্থ এবং দীর্ঘজীবন নিশ্চিত করা।

হৃদরোগের মহামারী ও একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ

বিশ্ব পটভূমি

বর্তমানে পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোতে মৃত্যুর এবং স্থায়ী বিকলাঙ্গের প্রধান কারণ হৃদরোগ। (২০২০ সালের মধ্যে) উন্নত বিশ্বের গন্ডি ছাড়িয়ে সারাবিশ্বেই এই রোগ মৃত্যুর প্রধান কারণ হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে। তবে এর প্রভাব তুলনামূলক বেশি পড়বে আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে। সমীক্ষার তথ্যগুলোতে দেখা যাচ্ছে যে, উন্নয়নশীল দেশগুলোতে মাতৃ এবং শিশুস্বাস্থ্য, অপুষ্টি এবং এইডস-এর মতো রোগগুলির বিস্তার কমে যাবে। পক্ষান্তরে করোনারি হার্ট ডিজিজের ঝুঁকিসমূহ বিশেষ করে ধূমপানের মাত্রা বেড়ে গিয়ে মৃত্যুর প্রধান কারণ হিসেবে আবির্ভূত হবে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, ১৯৯৮ সালে মোট মৃত্যুর শতকরা ৩০.৯ ভাগ মৃত্যুই ছিল হৃদরোগের কারণে। এর মধ্যে উন্নতদেশগুলোতে হৃদরোগে মৃত্যুর হার ৪০%-এর অধিক এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এই হার ২৫%-এর অধিক। ২০০৩ সালেও বিশ্বের সকল মৃত্যুর এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ প্রায় ১ কোটি ৭০ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়েছে হৃদরোগে। (২০২০ সালে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াবে ৪ কোটি ৯৭ লক্ষে।) হৃদরোগ বর্তমানে বিশ্বের এক নম্বর ব্যাধি। বর্তমানে প্রতিবছর এই রোগে ১ কোটি ৭৫ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়। ধারণা করা হচ্ছে ২০৩০ সাল নাগাদ এর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াবে ২ কোটি ৩০ লক্ষ।

এটা নিতান্তই চিন্তার বিষয় যে বর্তমান বিশ্বে শতকরা ৭৫ ভাগ মৃত্যুর মূল কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে হৃদরোগ ও স্ট্রোক এবং এর সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য রোগব্যাধি। এই ঝুঁকিকে বলা হয় ডাবল বার্ডেন (Double Burden)। যদি এখনই হৃদরোগ ও স্ট্রোক -এর প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা না নেয়া হয় তবে তা জনস্বাস্থ্যের জন্য জটিল সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়াবে এবং খুব দ্রুত এর প্রভাব সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে।

বিশ্ব প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের অবস্থান

সুনির্দিষ্টভাবে বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর মধ্যে করোনারি হার্ট ডিজিজ সম্পর্কিত অর্থাৎ এর কারণ, চিকিৎসা, মৃত্যুহার ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাপক কোনো গবেষণা যদিও নেই, তবুও ভারতবর্ষে অর্থাৎ ভারতীয় উপমহাদেশের জনগোষ্ঠীর উপর দেশে এবং বিদেশে কিছু আন্তর্জাতিক সমীক্ষা আছে। সেইসব সমীক্ষাগুলো থেকে আমরা জানতে পারি যে বিগত ৫০ বৎসরের ইতিহাসে ভারতীয় বংশোদ্ভূতরাই সবচেয়ে বেশি হৃদরোগে আক্রান্ত এবং মৃত্যুবরণ করেছে। গত ৩০ বছরে হৃদরোগে আক্রান্তের হার ভারতীয়দের মধ্যে বেড়েছে ২-৫ গুণ অথচ ঠিক এর বিপরীত চিত্রটি লক্ষ্য করা যায় পশ্চিমা বিশ্বে। যেখানে এই হার নেমে এসেছে প্রায় অর্ধেকে। আরও উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে, ৪০ বছরের কম বয়সী ভারতীয়দের ক্ষেত্রে এই হার বেড়েছে ৫-১০ গুণ। পৃথিবীর অন্যান্য জনগোষ্ঠীর তুলনায় ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম হার্ট অ্যাটাকের ঘটনা ঘটে ৫-১০ বছর আগে। প্রায় ৫৫% হার্ট অ্যাটাক হয় ৫০ বছরের নিচে আর ২৫% হয় ৪০ বছরের কম বয়সীদের। একটি কেন্দ্রের রিপোর্ট থেকে জানা যায় গত ২০ বছরে ৪০ বছরের কম বয়সীদের ক্ষেত্রে প্রথম হার্ট অ্যাটাক হওয়ার হার বেড়েছে প্রায় ৪৭ গুণ।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এক গবেষণায় দেখা গেছে, গত ২০০২ সালে বাংলাদেশে হৃদরোগে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ১,৩০,০০৬ জন এবং স্ট্রোকে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ৬৪,৫১৫ জন। এবং ভবিষ্যতে এ সংখ্যা আরোও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবার আশংকা রয়েছে।

উপরোল্লেখিত ডাটাসমূহ থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, মূলত এই দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির জন্য আগামী বছরগুলোতে হৃদরোগ হবে জনস্বাস্থ্য বিষয়ক মূল সমস্যা। হার্বার্ড স্কুল অব পাবলিক হেলথ-এর এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের তুলনায় আগামী ২০২০ সাল নাগাদ ভারতীয় উপমহাদেশেই সবচেয়ে বেশি লোক হৃদরোগে আক্রান্ত হবে।

মৃত্যুর প্রধান কারণ হৃদরোগ

২০০০ সালে হৃদরোগে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ১ কোটি ৬৭ লক্ষ যার মধ্যে ৮০ লক্ষ পুরুষ এবং ৮৭ লক্ষ মহিলা। পূর্বে সংক্রামক রোগ (Infectious Diseases) ছিল মৃত্যুর প্রধান কারণ, কিন্তু ক্রমশই হৃদরোগ তার ভয়াবহতার কারণে সংক্রামক রোগকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

উন্নত বিশ্বে ১৯৭০ সালের পর থেকে হৃদরোগের মৃত্যুর হার যদিও কমে আসছে তারপরও এখনও পর্যন্ত হৃদরোগ এবং স্ট্রোকই মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ। সকল মৃত্যুর প্রায় অর্ধেকই হয়ে থাকে হৃদরোগ এবং স্ট্রোকের কারণে এবং তুলনামূলকভাবে কম বয়সে।

উন্নয়নশীল বিশ্বের ক্ষেত্রে সংক্রামক রোগ ও বাতজ্বর বা রিউম্যাটিক হার্ট ডিজিজের পাশাপাশি দ্বিতীয় মহামারী হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে হৃদরোগ (করোনারি হার্ট ডিজিজ এবং স্ট্রোক)। হৃদরোগে মৃত্যুর হার উন্নয়নশীল দেশগুলোতে, যেখানে বিশ্বের জনগোষ্ঠীর শতকরা ৮০ ভাগ লোক বাস করে - সেখানেও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ১৯৯০ সালেই প্রথমবারের মতো মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে আবির্ভূত হয় হৃদরোগ (ছক-১)।

অঞ্চল	মহিলা		পুরুষ	
	সংক্রামক রোগ	হৃদরোগ	সংক্রামক রোগ	হৃদরোগ
প্রতিষ্ঠিত বাজার অর্থনীতি	১২	২৪৭	৪২	৪৮৩
পূর্বের সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি	৬	১৬৩	২০	২৬৩
ভারত	২৪০	৪৮১	৪২৯	৬১১
চীন	৮৯	৪৩৯	১৫৮	৫৭৬
এশিয়ার অন্যান্য দেশ	১৪০	২২৬	১৪৭	২৮৯
সাবসাহারা/আফ্রিকা	২২৪	২১১	২১৫	১৮৩
ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান	৪৮	১৪৭	৬২	১৮৬
মধ্যপ্রাচ্য	৮৫	২১৫	৮৩	২৮৫
সমগ্র বিশ্ব	৭৯৮	২২০১	১১২৮	৩০২৮

ছক-১

লিঙ্গ এবং অঞ্চল ভেদে ১৯৯০ সালে হৃদরোগে এবং সংক্রামক ও পেরাসাইটিক রোগে মৃত্যু (হাজারে)

কানাডার জনস্বাস্থ্য গবেষণা ইনিস্টিটিউটের ডা. সেলিম ইউছুফ ও তাঁর সহযোগীদের পরিচালিত সমীক্ষার রিপোর্ট অনুসারে উপরের ছক থেকে আমরা দেখতে পারছি যে ২০২০ সালে উন্নত দেশগুলোতে হৃদরোগে মৃত্যুহার বৃদ্ধি পাবে মহিলাদের ক্ষেত্রে শতকরা ২৯ ভাগ এবং পুরুষদের ক্ষেত্রে শতকরা ৪৮ ভাগ। পক্ষান্তরে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এই হার বৃদ্ধি পাবে মহিলাদের ক্ষেত্রে শতকরা ১২০ ভাগ এবং পুরুষদের ক্ষেত্রে শতকরা ১৩৭ ভাগ। আমাদের মতো এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলোতে এই চিত্র আরও ভয়াবহ যা কিনা মহিলাদের ক্ষেত্রে শতকরা ১৪৩ ভাগ এবং পুরুষদের ক্ষেত্রে শতকরা ১৪৯ ভাগ (ছক-২)।

অঞ্চল	1990	2020	%বৃদ্ধি	1990	2020	% বৃদ্ধি
প্রতিষ্ঠিত বাজার অর্থনীতি	838	1107	32	829	1209	48
পূর্বের সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি	559	702	26	468	712	52
সকল উন্নত দেশসমূহ	1397	1809	29	1297	1921	48
ভারত	556	1197	115	615	1405	127
চীন	377	684	81	386	811	110
এশিয়ার অন্যান্য দেশ	227	552	143	233	581	149
সাবসাহারা/আফ্রিকা	117	263	125	92	222	141
ল্যাটিন আমেরিকা	169	412	144	179	444	148
মাধ্যপ্রাচ্য	291	717	146	319	874	174
সকল উন্নয়নশীল দেশসমূহ	1737	3825	120	1828	4337	137
সমগ্র	3134	5634	80	3125	6258	100

ছক-২

অঞ্চল এবং লিঙ্গ ভেদে ১৯৯০ এবং ২০২০ সালের মধ্যে হৃদরোগে মৃত্যুর হার (হাজারে)

বয়স, লিঙ্গ এবং ধনবৈষম্যের উপর হৃদরোগের প্রভাব

বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনা করে দেখা গেছে ৩০-৬৯ বৎসর বয়সের মানুষের মৃত্যুর মধ্যে হৃদরোগের কারণে মৃত্যু পুরুষ এবং মহিলা উভয় ক্ষেত্রেই সংক্রামক রোগ ও প্যারাসাইটিক রোগ মৃত্যুর সংখ্যাকে অতিক্রম করেছে। এক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম সাবসাহারা/আফ্রিকার কিছু দেশ যেখানে হৃদরোগ এবং সংক্রামক রোগের মৃত্যুর হার প্রায় কাছাকাছি।

আর উন্নয়শীল দেশগুলোর ক্ষেত্রে প্রথম দিকে যদিও হৃদরোগ বিত্তবানদের মধ্যেই বেশি দেখা গেছে তাদের অনিয়ন্ত্রিত ক্ষতিকারক জীবনধারণের কারণে, কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে এই মৃত্যুর হার গরিবদের এবং অল্প শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যেই বেড়ে যাচ্ছে।

জাতীয় অর্থনীতিতে হৃদরোগের প্রভাব

দিনে দিনে এই ধারণা স্বীকৃতি পাচ্ছে যে, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সেই জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক স্বাস্থ্যব্যবস্থা একটি মূল চাবিকাঠি। সামগ্রিক বিশ্ব হিসেবে দেখা গেছে হৃদরোগ মানুষের কর্মক্ষমতা হ্রাসের (Disability-adjusted life year/Daly) প্রধান কারণ। ২০২০ সাল নাগাদ হৃদরোগ ও স্ট্রোক হবে মৃত্যু এবং শারীরিক অক্ষমতার যথাক্রমে তৃতীয় ও পঞ্চম বৃহত্তম কারণ। এ থেকে বোঝা যায় হৃদরোগ এবং স্ট্রোক উভয়ে মিলেই শারীরিক অক্ষমতার প্রধান কারণ হিসেবে আবির্ভূত হবে। এ অবস্থা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে স্বাস্থ্যসেবার ব্যয় বাড়িয়ে দিবে বহুগুণ। সুতরাং হৃদরোগ এবং স্ট্রোক প্রতিরোধ করা একটি সক্রিয় বাস্তব অর্থনৈতিকভাবে দায়িত্বশীল পদক্ষেপ, যার মাধ্যমে সামগ্রিক স্বাস্থ্য সেবার উপকরণগুলোকে রক্ষা করা যাবে, মানুষের কর্মক্ষমতাকে বৃদ্ধি করা যাবে এবং সামগ্রিকভাবে জনগোষ্ঠির জীবনযাত্রার মানকে উন্নত করা সক্ষম।

হৃদরোগের মহামারীর ক্রান্তিকাল

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ এবং অঞ্চল হৃদরোগের মহামারীর বিকাশের বিভিন্ন স্তরে অবস্থান করছে। অতীতে মৃত্যুর প্রধান কারণ ছিল সংক্রামক রোগের আধিক্য বা মহামারী। দিনে দিনে এ অবস্থা পাল্টে গিয়ে সংক্রামক রোগের স্থান দখল করে নিয়েছে দীর্ঘমেয়াদি কিছু রোগ যার মধ্যে হৃদরোগ এবং স্ট্রোক অন্যতম। মহামারীর এই ক্রান্তিকালকে আমরা চারটি পর্যায়ে ভাগ করতে পারি।

- প্রথম পর্যায়, দুর্ভিক্ষ এবং মহামারী অধ্যুষিত অঞ্চলে হৃদরোগে মৃত্যু হয় শতকরা ৫-১০ ভাগ লোকের। আফ্রিকা, এশিয়া এবং ল্যাটিন আমেরিকার কিছু অনুন্নত দেশে এই অবস্থা এখনও বিরাজ করছে।
- দ্বিতীয় পর্যায়ে, সাধারণত শতকরা ১০-৩৫ ভাগ মৃত্যুর জন্য দায়ী হৃদরোগের মধ্যে বিশেষ করে বাতজ্বর এবং উচ্চরক্তচাপের সাথে সম্পর্কিত রোগ। এই অবস্থা চীন এবং আফ্রিকার শহরাঞ্চলে বেশি দেখা যায়।
- তৃতীয় পর্যায়টা জুড়ে আছে মহামারীর আকারে হৃদরোগ যার মধ্যে করোনারি হার্ট ডিজিজ এবং স্ট্রোক অন্যতম এবং এই দুই রোগ মিলে

সামাজিক এবং অর্থনৈতিকভাবে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠির (৪৫-৬৫ বৎসর) শতকরা ৩৫-৫৫ ভাগ মৃত্যুর জন্য দায়ী। এই অবস্থা বিরাজ করছে এশিয়া, আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকার শহরাঞ্চলগুলোতে এবং পূর্ব-ইউরোপের দেশগুলোতে।

- সর্বশেষ পর্যায়ে হৃদরোগের মহামারীর ক্রান্তিকাল ধরা হচ্ছে সেই অঞ্চলগুলোকে যেখানে করোনারি হার্ট ডিজিজ ও স্ট্রোক এখনও মৃত্যুর প্রধান কারণ (শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ) বিশেষ করে বয়স্ক লোকদের ক্ষেত্রে। এই পর্যায় বিরাজ করছে পশ্চিম ইউরোপ, জাপান এবং অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ডে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এই অঞ্চলগুলোতে সাধারণত হৃদরোগে মৃত্যুর হার বিগত ৭০ এবং ৮০র দশক থেকে কমতে শুরু করেছে।

হৃদরোগ অধিকাংশক্ষেত্রেই প্রতিরোধযোগ্য

হৃদরোগের ঝুঁকিসমূহ (রিস্ক ফ্যাক্টর)

১. ধূমপান
২. উচ্চরক্তচাপ
৩. রক্তে উচ্চমাত্রায় কোলেস্টেরল
৪. ডায়াবেটিস
৫. মেদভুঁড়ি
৬. অনিয়ন্ত্রিত খাদ্যাভ্যাস
৭. অতিরিক্ত মদ্যপান
৮. অপর্যাপ্ত শারীরিক শ্রম এবং
৯. সামাজিক চাপ ও দুশ্চিন্তা

উপরোক্ত ঝুঁকিসমূহের নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে হৃদরোগ প্রতিরোধের পাশাপাশি অন্যান্য অসংক্রামক রোগ যেমন : ক্যান্সার, ফুসফুসের রোগ, ডায়াবেটিস, কিডনী এবং লিভারের রোগও প্রতিরোধ করা সম্ভব।

১৯৯২ সালে এক সমীক্ষায় বলা হয়েছিল যে সারাবিশ্বে সমগ্র জনগোষ্ঠীর ১০ ভাগ মানুষ অর্থাৎ প্রায় ৪৫ কোটি লোক শুধুমাত্র ধূমপান বা তামাক জাতীয় দ্রব্য ব্যবহারের কারণে মৃত্যুবরণ করবে। আর আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে হৃদরোগের কারণও তামাক জাতীয় দ্রব্যের ক্রমবর্ধমান ব্যবহার। সুতরাং তামাক বা ধূমপানের নিয়ন্ত্রণ হৃদরোগ প্রতিরোধে বহুমুখী পদক্ষেপের একটি প্রধান ভূমিকা হতে পারে। এমনকি অল্প পরিমাণে প্রধান ঝুঁকিসমূহের সামান্য নিয়ন্ত্রণই হৃদরোগের মৃত্যুর হারকে কমাতে পারে।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, রক্তে কোলেস্টেরলে মাত্রা যদি শতকরা ১ ভাগ কমানো যায় অথবা ডায়াস্টোলিক ব্লাডপ্রেসার ১ মি.মি. মারকারি কমানো যায় তবে হৃদরোগে মৃত্যুর ঝুঁকি শতকরা ২-৩ ভাগ কমে যাবে। আর একজন ধূমপায়ী ধূমপান ছেড়ে দিলে তার হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা নেমে আসে অর্ধেকে।

হৃদরোগ প্রতিরোধ এখন অতীতের তুলনায় এখন অনেক বেশি বাস্তব ধারণা। সম্প্রতি বিশ্বের প্রায় ৫০টি দেশে পরিচালিত পৃথিবীর সর্ববৃহৎ সমীক্ষা ইন্টারহার্ট স্টাডির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. সেলিম ইউসুফ দেখিয়েছেন

যে, শতকরা ৯০ ভাগ হার্ট অ্যাটাক ব্যাখ্যা করা যায় উপরে উল্লিখিত নয়টি সুপরিচিত রিস্ক ফ্যাক্টরের মাধ্যমে। যার অধিকাংশই মানুষের জীবনধারার সাথে সম্পর্কিত। সুতরাং আমরা বলতে পারি এই নয়টি রিস্ক ফ্যাক্টর যদি জীবনধারা পরিবর্তনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয় তবে আমরা শতকরা ৯০ ভাগ হৃদরোগ প্রতিরোধে সক্ষম হব। আর বাকি ১০ ভাগের জন্য প্রয়োজন হবে চিকিৎসার।

প্রয়োজন হৃদরোগ এবং স্ট্রোক প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ–

আমরা ইতিপূর্বে হৃদরোগ প্রতিরোধে যত লেখা বা কথা বলেছি তার অধিকাংশই রোগীর প্রতি পরামর্শমূলক লেখা কিন্তু সামগ্রিকভাবে একটি দেশ বা জনগোষ্ঠীকে হৃদরোগের মহামারী থেকে মুক্ত রাখতে হলে প্রয়োজন সমন্বিত পদক্ষেপ। এক্ষেত্রে নিম্নলিখিত প্রত্যেকেরই ভূমিকা রাখার সমান সুযোগ রয়েছে। যেমন :

১. **প্রতিটি ব্যক্তি/রোগী :** নিজে শিক্ষিত এবং সচেতন হয়ে তাঁর নিজের জীবনধারার পরিবর্তনের মাধ্যমে এবং চিকিৎসকের পরামর্শ যথাযথভাবে মেনে চলার মধ্য দিয়ে হৃদরোগ প্রতিরোধ সম্ভব।

২. **পরিবার :** পরিবারের আন্তরিক সহযোগিতা এবং সহমর্মিতার মাধ্যমে সঠিক জীবনধারায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব।

৩. **ডাক্তার বা হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ :** একজন ডাক্তার ব্যক্তিগতভাবে রোগীকে হৃদরোগের কারণ, প্রতিরোধের উপায় এবং চিকিৎসা সম্পর্কে খোলাখুলি আলোচনার মাধ্যমে ভূমিকা রাখতে পারেন।

৪. **হৃদরোগ বিশেষজ্ঞদের সংগঠন তথা ডাক্তারদের জাতীয় সংগঠন :** হৃদরোগ প্রতিরোধে কার্ডিয়াক সোসাইটি এবং মেডিক্যাল এসোসিয়েশন পালন করতে পারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। ডাক্তারদের নিয়ে নিয়মিত সি,এম, ই-প্রোগ্রাম করা, হৃদরোগের চিকিৎসা এবং প্রতিরোধের ক্ষেত্রে জাতীয় অবস্থার কথা বিবেচনায় এনে সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন তৈরি করা এবং নিয়মিত জার্নাল ও বুলেটিন প্রকাশের মাধ্যমে এটা করা সম্ভব।

৫ **স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান :** হৃদরোগের উপর সচেতনতামূলক লেখা পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্তকরণ এবং নিয়মিত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা।

৬. **বিভিন্ন সামাজিক সেবামূলক সংগঠন :** হৃদরোগ প্রতিরোধমূলক বিভিন্ন জনসচেতনতামূলক সভা-সমাবেশ, প্রচারপত্র প্রকাশের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

৭. **সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন** : এ সমস্ত প্রচারমাধ্যমগুলির রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার অপরিসীম সুযোগ। হৃদরোগের প্রতিকার এবং চিকিৎসা বিষয়ক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষামূলক, বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান, বিভিন্ন ফিচার, শর্টফিল্ম এবং আর্টিকেলের প্রচার করতে পারে।

৮. **প্রশাসন** : হৃদরোগ প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন সংগঠনকে সহযোগিতার মাধ্যমে, হৃদরোগ প্রতিরোধে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা কার্যকর করতে আইনগত সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে ভূমিকা রাখতে পারে।

৯. **স্বাস্থ্যনীতি** : সরকারি স্বাস্থ্যনীতির মধ্যে হৃদরোগ প্রতিরোধে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা গ্রহণ ও তার বাস্তবায়ন যা কিনা শুধু সরকারের মাধ্যমেই সম্ভব।

শেষ কথা

বিদ্যমান ধারণা থেকে আমরা বলতে পারি Coronary Artery Disease (CAD) বা হৃদরোগ প্রতিরোধ যোগ্য। হৃদরোগ এখন আর বয়স্কদের রোগ নয়। বরং এই রোগটি যে কোনো বয়সের শিশুদের, কিশোর-কিশোরীদের, তরুণ-তরুণীদের, পুরুষ এবং মহিলাদের ঝুঁকির কারণ হয়ে থাকে। এ রোগটি ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সবার জন্যই ঝুঁকির কারণ। এখন পর্যন্ত এ রোগটি উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোতে মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। সুতরাং হৃদরোগ একুশ শতকের একটি প্রধান স্বাস্থ্য সমস্যা। যদি এই সমস্যাকে এখনই প্রতিরোধ করা সম্ভব না হয় তবে আগামী ২০২০ সাল নাগাদ প্রতি ১০০ জন লোকের মধ্যে ৩৬ জন মারা যাবে হৃদরোগ এবং স্ট্রোকের কারণে এবং এই মৃত্যুহার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোতে। আর দুঃখজনক হলেও সত্যি হৃদরোগের চিকিৎসা ব্যয়ভার বহন করা হবে এ সমস্ত দেশগুলোর জন্য এক বিরাট বোঝা।

সুতরাং আসুন, আমরা সবাই আমাদের জীবনধারা পরিবর্তন করে হৃদরোগের মহামারীর হাত থেকে নিজেকে, দেশকে এবং বিশ্বকে রক্ষা করি।